স্বাধীন বাংলাদেশ

শুভ জন্মলগ্নে তোমাকে জানাই
আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন—

বাংলা দেশের যে-সব বীর মুক্তিফৌজ ও স্বাধীনতা কামী মানুষ তাঁদের পবিত্র জন্মভূমির মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেলেন, আর তাঁদের সাহায্যার্থে আমাদের ভারতের যে-সব বীর জওয়ানরা মৃত্যুপণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হলেন, সেইসব মহান বীর সৈনিকদের উদ্দ্যেশে আমার এ-বই উৎসর্গ করলাম। —প্রকাশক

জয় বাংলা

জয় মুক্তি ফৌজ

সপ্তবহ্নি

মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫বি, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৭৮

প্রকাশক : প্রশান্ত তালুকদার
১৫বি, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : শ্রীচন্দ্রশেখর দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭সি, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য : চার টাকা

জয় বাংলা

স্বাধীন বাংলার একটি গ্রাম শহর।

জনসভায় শেখ মুজিবরের।

মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে ভারতীয় জওয়ানরা এগিয়ে চলেছেন।

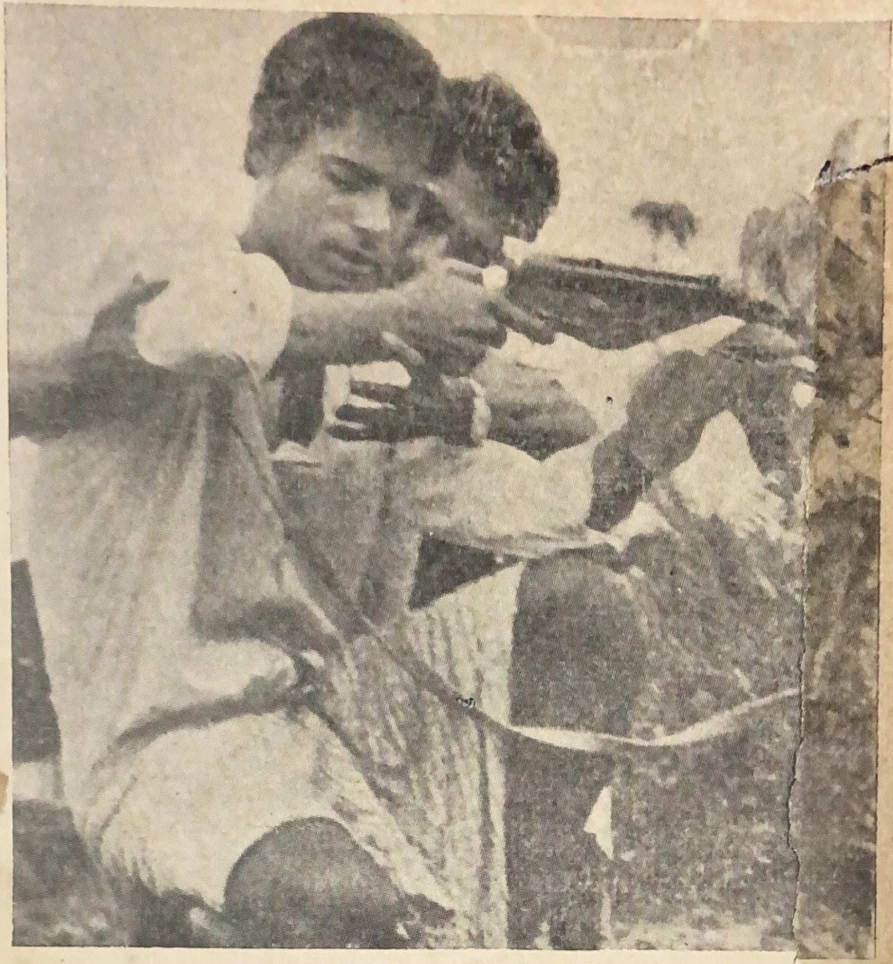

মুক্তিবাহিনী গেরিলা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

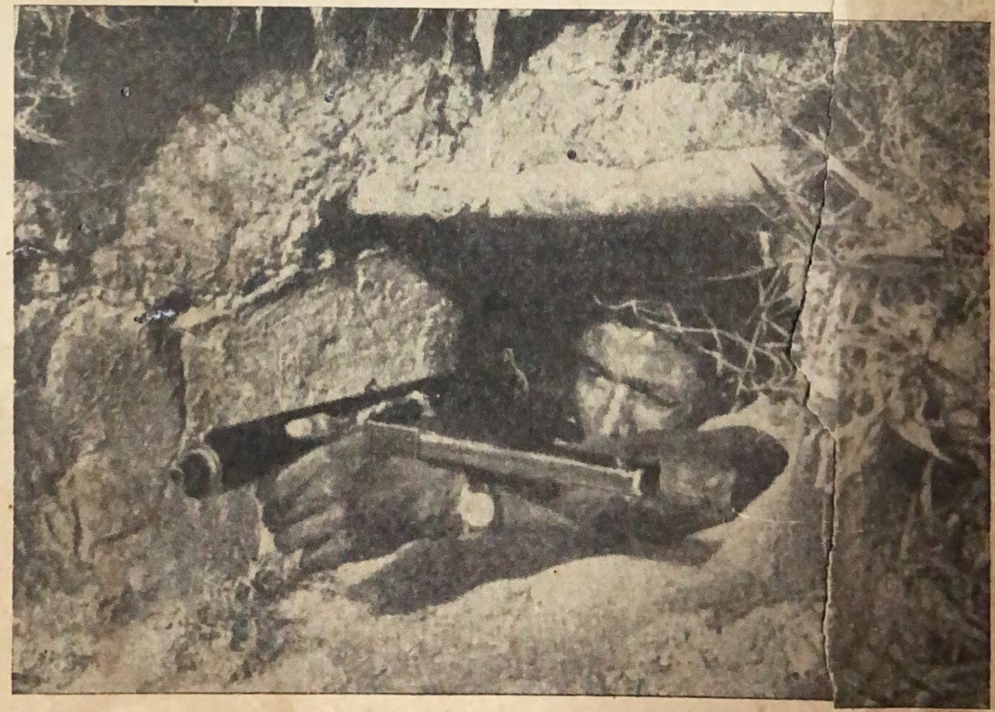

মুক্তিবাহিনী শত্রুর মোকাবিলা করছেন।

১

'পূবের আকাশে সূর্য উঠেছে
আলোয় জ্যোতির্ময়।
জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা জয়।

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে আজ এই গান, এই সুর, এই ধ্বনি। তাদের কণ্ঠে আজ নতুন সুর। বাংলা দেশ স্বাধীন। তারা ঘোষণা করেছে স্বাধীনতা। স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত, ভূটান। পশ্চিমের পররাষ্ট্রলোলুপ স্বৈরাচারী ভুট্টো-ইয়াহিয়া চক্রান্ত তারা ভেদ করতে চলেছে। তারা চায় মানুষের অধিকার—চায় বাঁচার অধিকার।

কিন্তু প্রাতপক্ষও নীরব নেই। তাঁদের সে বিপুল অত্যাচারের কাহিনী আজ আর কারও অজানা নেই - তা জানে প্রতিটি মানুষ।

প্রথম দফায় জঙ্গী, স্বৈরাচারী, জহ্লাদ ইয়াহিয়া খাঁর দশ হাজার বাঙালী হত্যা তার প্রথম সাক্ষী। দ্বিতীয় সাক্ষী হলো পরবর্তী দফায় ২৫শে মার্চ ১৯৭১ থেকে পরবর্তীকাল অবধি আরও সাত আট লক্ষ নরনারী, শিশু বৃদ্ধকে নির্মমভাবে অত্যাচার, নারীধর্ষণ, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনা।

কিন্তু কেন এত সব ঘটনা ঘটল। কেন বাংলা দেশ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় মুক্তিফৌজ পশ্চিমী জহ্লাদদের পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জন করল সে কথা বলতে হলে অনেক কিছু আলোচনা করতে হয়—সুদীর্ঘ এক ইতিহাস। পাকিস্তানের

নামে, ধর্মের নামে বাংলাকে দুভাগ করে পশ্চিমা শাসকদের একটানা অত্যাচার আর বিরাট নিপীড়নের ইতিহাস।

কায়েদে আজম জিন্না ধর্মান্ধতার আফিম খাইয়ে পূর্ববাংলার প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা সরল মানুষদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছিলেন। শুধু জিন্না কেন, পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতাই সেদিন বাংলার সাধারণ মানুষদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছিলেন। কেউ বুঝত—কেউ বা তা বুঝত না।

সমগ্র পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার নামে সহস্র সহস্র মাইল দূর থেকে এসে পশ্চিমা নেতারা, পাঞ্জাবী নেতারা পূর্ব বাংলায় একেবারে স্থায়ী আসন দখল করে বসেছিল।

কাছাকাছি লোকদের ওরা পর করে দিল, দূরের লোকদের ওরা নিল আপন করে। দূরে থাকি বা কাছেই থাকি—তবু ওরা সুখে থাক। ভারত ভাবত, ওরা সুখেই আছে! ওদের নিজেদের রাষ্ট্র হয়েছে। এবং ধর্মের ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। ধর্ম পবিত্র জিনিস, ধর্ম মানুষকে ন্যায় পথে চালনা করে। কিন্তু তখন আমরা ভাবিনি, ধর্মের ভেক ধরে অধর্ম ও অন্যায় আসতে পারে। তখন ভাবতে পারিনি পশ্চিম পাকিস্তানীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের সংহতির প্রশ্ন তুলে—পূর্ব বাংলাকে একটা কলোনিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষেরা আনন্দ ভোগ করবে, পূর্ববাংলার মানুষ আনন্দের উপকরণ জোগাবে।

স্বাধীনতার সব স্বাদটুকু পশ্চিম পাকিস্তানীরাই ভোগ করবে—পূর্ব বাংলার মানুষ শুধু তাকিয়ে দেখবে। ওরা কোর্মা কালিয়া খাবে, এরা আঙ্গুল চুষবে।

সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে, দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দপ্তরই পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ববাংলার সম্পদ

পশ্চিম পাকিস্তানেই পাচার ও স্তূপীকৃত হচ্ছে, সামরিক বিভাগেও পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য।

সমগ্র পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ ভাগ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় হয়, শতকরা ৩২ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনায় অর্থাৎ মোট রাজস্বের ৯৪ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হবে, মাত্র ৬ ভাগ পূর্ববাংলায় ব্যয়িত হবে।

এই নিয়ম চলছিল পাকিস্তান সৃষ্টি থেকে তার পরে অবধি।

নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব বাংলায় অনায়াসে করা যেত—অস্ত্র কারখানাও।

কিন্তু না, তা হয়নি।

আমি আর তুমি এক। কিন্তু তোমার যা কিছু আছে সবই আমার। সব সুখসুবিধাটা আমার। তবু তুমি আর আমি এক। এরই নাম পাকিস্তানী সাম্যবাদ।

কিন্তু ধর্মের স্থান পাকিস্তান, সেখানে সব কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানীদের—পূর্ব বাংলার মানুষদের জন্য কিছু নয়। পূর্ব বাংলার মানুষদের সমান দাবী করা অন্যায়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে গোঁড়া মুসলমান, পূর্ব বাংলার মানুষের যে হিন্দু ঘেঁষা! জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো দাড়ি না রেখেও মৌলভী। ওরা হজে না গিয়েও হাজী সাহেব।

পূর্ব বাংলার মুসলমান ধর্মীয় অনুশাসন মেনে দাড়ি রাখলেও—পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমানদের মতো খাঁটি মুসলমান হতে পারে কি ?

কখনই না। ওদের সংস্কৃতি, ওদের ভাষা—সবই যে কাফেরদের মতো।

কোনো কোনো বাঙালী মুসলমান আবার কাফেরদের মতো ধুতি পরে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমান সম্প্রদায় ধুতির কাছ থেকে দশ হাত দূরেই থাকে।

সেইজন্য পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সমান দাবী করা অন্যায়। যারা ও ধরণের দাবী করে—তারা বেতমীজ, রাষ্ট্রদ্রোহী, কাফের।

তাইতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে টিক্কা খাঁদের মতো খয়েরখাঁ-গণই পূর্ব বাংলার কোনো মিঞাই পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের খয়েরখাঁ বনতে পারবে না।

এ ধরণের দাবী করাই অন্যায়। পাকিস্তানকে খণ্ড বিখণ্ড করার ফিকির।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনকর্তাগণ ও-ধরণের বে-আদবী কখনই ক্ষমা করবে না। তৈমুরলঙ, চেঙ্গিস খাঁ অথবা নাদিরশাহের বংশধরগণ পশ্চিম পাকিস্তানে গিজ গিজ করছে। তাঁরা বেঁচে থাকতে পূর্ব বাংলার কোনো মুসলমান পাকিস্তানের পবিত্র তক্তে বসতে পারে কি?

ওরা পাট বুনবে, ক্ষেতে ফসল ফলাবে—হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে পাকিস্তানের অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে। এই না হলে মুসলমান।

অবসর সময়ে কি করবে?

কাফেরদের পাকিস্তান থেকে তাড়াবে। ভারত-বিদ্বেষী প্রচার করবে। তবেই তো বোঝা যাবে যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তানের জন্য দরদ আছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তো কাফের। সেইজন্য পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রনাথকেও হঠাতে হবে।

ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলার মানুষদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, পাকিস্তানী আমলে সেটুকুও ছিল না।

গণতন্ত্র?

পূর্ব বাংলার মানুষেরা যে সংখ্যা গরিষ্ঠ। গণতন্ত্রের বনিয়াদ শক্ত করলে মুস্কিল। অতএব পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের খতিরেই

গণতন্ত্রকে গোল্লায় দেওয়া হলো। করাচী বা পিণ্ডির মসনদকে কেন্দ্র করে পালা বদলের পালা চলল।

মিলিটারী রুল ?

মিলিটারী রুল হলেও—পশ্চিম পাকিস্তানীদের ক্ষতি কি ? মিলিটারীতে যে ওদেরই প্রাধান্য।

সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলার মানুষ, সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছে যে। সহস্র মাইল দূর থেকে এসে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ধর্মের দোহাই দিয়েছিল—সংহতি রক্ষার কথা বলেছিল।

গোড়ার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেনা যায় নি। ওরা কিন্তু ধর্মের ভেক ধরে এসে পূর্ব বাংলার মাটিতে অধর্ম ও অন্যায়ের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল।

বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ আর জীবনানন্দের রূপসী বাংলাকে ধর্মান্ধতার অতল পঙ্কে ডুবিয়ে রেখেছিলেন পাকিস্তানের স্রষ্টাগণ। বিশ্বকবির সোনার বাংলা ডুবে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল।

ইসলামের নাম করেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব বাংলার মানুষদের ওপর উর্দু চাপিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বকবির সোনার বাংলায় বিশ্বকবির স্থান রইল না। থাকবে কি করে, সংহতির প্রশ্ন তুলে—পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার ওপর আঘাত হেনেছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা। শোষণের স্বার্থেই ওরা পূর্ব বাংলাকে ধর্মান্ধতার পঙ্ককুণ্ডে ডুবিয়ে রেখেছিল।

মাঝে মাঝে সেই পঙ্ককুণ্ড থেকে ভেসে আসা ওপার বাংলার ক্রন্দন ধ্বনি এপার বাংলায় বসে শুনতে পেতাম, ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ওপার বাংলার প্রাণ স্পন্দনও শুনতে পেয়েছিলাম। সেদিন আমার মনে হয়েছিল বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ,

আর জীবনানন্দের রূপসী বাংলা—পাকচক্রের ধর্মান্ধতার পঙ্ককুণ্ড থেকে বেরিয়ে আসবে।

এইভাবে দিন কাটতে থাকে ওপার বাংলার সব লোকের। তাদের মধ্যেও বুঝি বার বার জেগে ওঠে এপার বাংলার এই ক্রন্দন ধ্বনির স্পন্দন।

ছেলেবেলায় পাকিস্তানে থাকতে আমার এক বন্ধু ছিল নাম রহিম। আজ বাংলাদেশের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে সে কোলকাতায় এসেছিল। মৌলালীর মোড়ে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। আমি চিনতে পারিনি। ও আমায় চিনতে পেরেছিল।

ওর চেহারাটা এমন—হিন্দু কি মুসলিম বোঝা দায়। ছেলেবেলার সেই রহিম, বড় হয়ে যে আমায় চিনতে পারবে, ভাবতেও পারিনি। দুজনে কত কথা হলো—হলো কত আলাপ। রবীন্দ্র সংগীত আর নজরুলের গান রহিম ভালবাসত—আজও ভালবাসে ঠিক আগের মতোই। তার দুটি চোখে দেখলাম এখনো সেই বিদ্রোহের স্বপ্ন—সেই জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা।

* * * *

বৃটিশ আমলেও ওপার বাংলা পরাধীন ছিল বটে, তবে তখন তার মানুষরা ছিল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা। ওপার বাংলার বীর শহীদরা একদিন বৃটিশ সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলেছিল। যদিও তারপর বাংলা ভাগ হয়েছে—পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র আর ইছামতী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, তবুও সেখানের মানুষের দুর্দশার কথাটা ভাবলে দুঃখ জাগে মনে।

হয়তো বা বহু আগেই ফেটে পড়তে চেয়েছিল ওদের বিক্ষোভ। ধর্মের জিগীর তুলে মোল্লা মৌলভীরা চাপা দিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানের আসল রূপ। তবে তা চাপা থাকেনি।

পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই সব কিছু—প্রশাসন, ফৌজ,

ব্যবসা বাণিজ্য, বড় বড় শিল্প। পূর্বের মজা পশ্চিমেরাই লুটছিল। উর্দুকেই ওরা রাষ্ট্রভাষা বানাতে চেয়েছিল।

উর্দু পূর্ব বাংলায় কেউ বলে না। উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য পূর্ব বাংলার মানুষদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। বিদ্রোহী হতে হয়েছে। তোয়াজ করে যা পাওয়া যায়নি, লাল চক্ষু দেখিয়ে তা পাওয়া গেছে। বড় বড় পদগুলো পশ্চিম পাকিস্তানী পাঞ্জাবীরা অধিকার করে বসে রয়েছে। সৈন্য বাহিনীতে পূর্ব বাংলার মানুষেরা অবহেলিত—অধমের অধম।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ চেয়েছিলেন বাঙালীরা দাস হয়েই বেঁচে থাকবে। ওরা মানুষের মত মানুষ হলেই বিপদ। ওরা মাথা চাড়া দিলে পশ্চিম পাকিস্তানের আনন্দের উপকরণ যোগাবে কে? বাঙালীদের বড় জোর কেরাণী, শিক্ষক, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার হতে দেওয়া যায়—এর বেশী কিছু দিলেই বিপদ।

পাকিস্তানের মজা লুটবে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবীরা। দয়া করে যা দেওয়া হবে—বাঙালীদের চেটেপুটে খেতে হবে। ধর্মের জিগীর তুলে, সমগ্র পাকিস্তানের সংহতির প্রশ্ন তুলে ওদের দাবিয়ে রাখতে হবে।

পাকিস্তানের কর্তারা অনেক অত্যাচার অনেক নিপীড়ন করেছেন। তবু পূর্ব বাংলার ধর্মানুরাগী মানুষ ধৈর্য ধরেছিল। ধৈর্য ধরে তাদের থাকতে হয়েছিল।

পূর্ব বাংলার মানুষদের হয়ে যতই ন্যায্য দাবী তুলতে চেষ্টা করেছিল, ততই পশ্চিম পাকিস্তানী মুরুব্বীরা লাল চক্ষু দেখিয়েছেন।

জনাব ফজলুল হকও বুঝতে পেরেছিলেন, কয়েদে আজম জিন্নার সাধের পাকিস্তান পূর্ব বাংলার মানুষদের জন্য প্রকৃতই ফাঁকিস্তান। জীবনের সায়াহ্নে এসে যখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তখন তিনি প্রায় বৃদ্ধ অথর্ব।

শের-ই-বাঙালের সে তেজ তখন আর কোথায় ?

জনাব ফজলুল হককেও পশ্চিম পাকিস্তানী প্রশাসকগণ দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিলেন।

শের-ই-বাঙাল হয়ে শ্রদ্ধা পাচ্ছ ক্ষতি নেই, তাই বলে পাকিস্তানে থেকে পূর্ব বাংলার স্বার্থের কথা বলা চলবে না। ধর্মের জিগীর তোল, ভারত বিদ্বেষী প্রচার কর, পশ্চিম পাকিস্তানীরা তোমায় মাথায় তুলে নাচবে। কিন্তু তাই বলে পাকিস্তানে থেকে পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবী আদায় করার চেষ্টা চলবে না।

শুধু কি জনাব ফজলুল হক, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা শহীদ সুরাবর্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করতে হয়েছিল।

পাকিস্তানে থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে সমান তালে চলতে চাইলেই অপরাধ।

ভেতো বাঙালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও—পাকিস্তানের স্বার্থের খাতিরে সমান অধিকার দেওয়া যায় না। পিণ্ডি যতই অন্যায় করুক, অবিচার করুক, ঢাকার মুখ ঢেকে বসে থাকতে হবে। তাই বলে ঢাকার মানুষ এসে পিণ্ডির পিণ্ডি চটকাতে চেষ্টা করবে ? তা হতে পারে না।

এই ভাবেই চলে এসেছিল এতদিন ধরে। সেই ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭এ পাকিস্তান সৃষ্টি হবার দিন থেকে এতদিন অবধি চলেছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

২

'এসেছে সে একদিন।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

পূর্ব বাংলার বুকে যে নতুন এক জাগ্রত জীবনের সূচনা হলো তার মূল ব্যক্তিটি হলেন শেখ মুজিবর রহমান।

মুজিবর শুধু একটি বিশেষ ব্যক্তি নন—তিনি হলেন বাঙলা তথা বাঙালী জাতির মুক্তির প্রতীক। তাদের আশা আকাঙ্খা দুঃখ বেদনা সব যেন এই শেখ মুজিবরের মাঝ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তাই আজ বাঙালী জাতি প্রাণ দিতে ভয় পায় না। সারা বিশ্বে তারা সৃষ্টি করছে নতুন এক ইতিহাস। সে ইতিহাস ত্যাগের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস, বেদনার ইতিহাস, প্রাণ দেওয়া ও নেওয়ার ইতিহাস।

এই ইতিহাসের সৃষ্টি কি করে হলো সে কথা বলতে গেলে বলতে হয় বিরাট ইতিহাস। সেই ইতিহাস বর্ণনা না করলে বাংলা তথা বাঙালীর এই সংগ্রামের ইতিহাস প্রকাশ করা যায় না। তাই সেই ইতিহাস বর্ণনা করা হচ্ছে।

সে ইতিহাস আজকের ইতিহাস নয়। বাঙালীর বিরুদ্ধে এ চক্রান্ত আজ সৃষ্ট হয়নি। পূর্ব বাংলাকে শোষণ করার এই ইতিহাসের শুরু হয়েছিল সুদীর্ঘদিন আগে।

মহাত্মা গান্ধী বললেন ভারতের হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সব এক জাতি। সবাই ভারতীয়। তাই ভারতের ন্যাশনাল কংগ্রেসে সবারই ছিল সমান অধিকার। কিন্তু মহম্মদ আলী জিন্না বৃটিশের সহায়তায় নতুন এক ধূয়া তুললেন। তার নাম হলো দ্বিজাতী নীতি।

বৃটিশের ছিল Divide and rule Policy—অর্থাৎ ভাগ করে শাসন কর। তা মানলেন জিন্না সাহেব। তিনি তাদের পাকে পড়লেন।

জিন্না বললেন—ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি—ধর্মের ভিত্তিতে তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক জাতি বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে, ভারত স্বাধীন হলে হিন্দুদের জন্যে হবে যেমন হিন্দুস্থান, তেমনি মুসলমানদের জন্যে চাই পৃথক রাষ্ট্র—তার নাম হবে পাকিস্তান।

কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন এতে যে কম ব্যাহত হয়েছে তা নয়। তবু জিন্না তাঁর দাবীতে অচল, অটল। সুযোগ বুঝে বৃটিশ সরকার তাঁর এই দাবীতে ইন্ধন জোগাল। তার ফলে দিনে দিনে জিন্নার সৃষ্ট মুস্লিম লীগ হয়ে উঠতে লাগল বেশ শক্তিশালী।

এদিকে কংগ্রেসের আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে—ভারত স্বাধীনতা চায়।

জিন্নার নীতিও থাকল অবিচল। তিনি তাঁর পাকিস্তানের দাবী করেই চললেন।

১৯৪৭ সন। ভারতের নেতাজী সুভাষ পালিয়ে গেলেন ভারত থেকে জার্মানীতে। সেখানে প্রথমে সৃষ্টি করলেন তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ। সেখান থেকে টোকিওতে গেলেন তিনি। বিরাট আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দবাহিনী গঠিত হলো। আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মা দখল করে এগিয়ে এলো ভারতের দিকে।

See copy

এদিকে বৃটিশ সরকার সব বড় বড় কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করলেন। গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজী, নেহেরু, মৌলানা আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি দেশের প্রধান নেতৃবৃন্দ।

জেলে বসেই মহাত্মাজী জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন। বললেন—বৃটিশ ভারত ছাড়—কুইট ইণ্ডিয়া! স্বাধীনতা আমরা চাই—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ডু অর ডাই।

সারা দেশে সংগ্রাম শুরু হলো। কতো হলো গ্রেপ্তার—কতো হলো নিহত। তবু সে সংগ্রাম থামল না।

এদিকে বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জিতলেও তারা বুঝলে ভারতকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাকে স্বাধীনতা দিতেই হবে। কোনও উপায় নেই এই স্বাধীনতা না দিয়ে। তাই পার্লামেণ্টে পাশ করালেন প্রধানমন্ত্রী এটলী যে তিনি ভারতকে স্বাধীনতা দেবেন। ভারতের বুকে নৌ বিদ্রোহ, সেনা বিদ্রোহ প্রভৃতিও শুরু হয়েছিল। তাই বৃটিশ সরকার স্বাধীনতা দিতে রাজী হলো।

কিন্তু স্বাধীনতা আমরা কাকে দেবো? স্বাধীনতার দুই দাবীদার কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ। কংগ্রেস চায় অখণ্ড স্বাধীন ভারত আর মুসলীম লীগ চায় ভারতকে বিভাগ করতে হবে—তারা চায় পৃথক এক পাকিস্তান রাষ্ট্র।

এদিকে তখন ভারতে এলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। তিনি এসেই ঘোষণা করলেন—আমি স্বাধীনতা দেবার জন্যেই এসেছি ভারতে।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন প্রথমে এক বছরের জন্য একটা অন্তবর্তী সরকার বা ইন্‌টারিম গভর্ণমেণ্ট গঠন করলেন। বললেন—আমি দেখতে চাই ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র চালাতে পারে কিনা। তারপর দেবো পূর্ণভাবে স্বাধীনতা।

কংগ্রেস এই সরকারে যোগ দিল—কিন্তু মুসলীমলীগ যোগ দিল না। তাদের দাবী হলো, পাকিস্তান স্বীকার না করলে আমরা যোগ দেব না। বাধ্য হয়ে তখন মেনে নিতে হলো। সবাই বললেন—ঠিক আছে এ নিয়ে আমরা চিন্তা করবো—তোমরা যোগ দাও এই সরকারে। লিয়াকৎ আলি খাঁ প্রভৃতিরা তখন তাতে যোগ দিলেন।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বললেন—এক বছর কেটে গেলেই এবার আমি পূর্ণ স্বাধীনতা দেব। তার জন্যে আপনারা প্রস্তুত হোন।

১৯৪৬এর ১৫ই আগস্ট তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হাসান

সুরাবর্দী ঘোষণা করলেন, Direct action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এট আসলে কিছুই নয়। এটি হলো আসলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কোলকাতায় তা শুরু হলো—তারপর তা ছড়িয়ে পড়ল নোয়াখালী ও বিহারে। সারা দেশ সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যেন উত্তাল হয়ে উঠল।

বৃটিশ সরকার তখন বললেন—এরপর ভারত বিভাগ না করে উপায় নেই। তা না হলে আমরা স্বাধীনতা দিতে পারি না। গান্ধীজী অবশ্য তাতে রাজী হলেন না।

নেহরু বললেন—ঠিক আছে। আগে দেশ ত স্বাধীন হোক, বৃটিশ বিদায় হোক, আমরা ভায়ে ভায়ে মিটমাট করে নেবো।

কিন্তু সে মিটমাট করা সম্ভব হলো না। তার কারণ হলো, যারা পাকিস্তান সৃষ্টি করল তারা ও তাদের তাঁবেদার দেশগুলি উস্কানি দিয়ে ভারত বিরোধী জিগীর চালিয়ে যেতে লাগল। তার ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব অসম্ভব হয়ে উঠল।

এইভাবে বৃটিশের কূটনীতির ফলে দেশ স্বাধীন হলো বটে, কিন্তু দুটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো। ১৯৪৭ সনে দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুদেশ নিয়ে সৃষ্টি হলো পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ববাংলা হলো পূর্ব পাকিস্তান।

বাংলার এই বিভাগ অনেকে চান নি। যেমন শরৎচন্দ্র বসু, জনাব ফজলুল হক প্রভৃতিরা। কিন্তু তবু তা হলো বৃটিশের চক্রান্তে আর জিন্না সাহেবের এই খামখেয়ালিতে।

অবশ্য পূর্ববাংলার মুসলমানরাও তখন জিন্না সাহেবের এই ধর্মের জিগীরে ভুলে গেল। তারাও স্বীকার করে নিল পাকিস্তান। তারা ধর্মকেই বড় করে দেখল—দেখল না ভাষা, সংস্কৃতি ও অন্তরের টানকে।

• • •

পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পরেই কিন্তু সে দেশের অর্থাৎ পূর্ববাংলার

মুসলমানরা ধর্মান্ধতায় মেতে উঠল। তার কারণ হলো পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ বিদেশী মুসলমান গেল পূর্ববাংলায়। পূর্ববাংলার মুসলমানরা তখন নিরক্ষর। তাদের বোঝানো হলো, ওরা সব হিন্দু --ওরা কাফের—ওদের তাড়াও।

তাই পূর্ববঙ্গে শুরু হয়ে গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সে দাঙ্গা চলতেই লাগল। চলল হিন্দুদের উপর অত্যাচার, গৃহভস্মীভূত করা, নারী ধর্ষণ, হত্যা, লুটতরাজ প্রভৃতি। দলে দলে হিন্দুরা পূর্ববাংলা ছেড়ে চলে এলো পশ্চিমবঙ্গে।

পাঞ্জাবেও চলেছিল একই ধরণের ঘটনা। কিন্তু সেখানে ভারত ও পাকিস্তান মিলে করল জনবিনিময়। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হিন্দুরা পূর্বে চলে এলো। পূর্ব থেকে মুসলমানরা গেল পশ্চিম পাঞ্জাবে। তার ফলে এই সাম্প্রদায়িক ঝামেলা বন্ধ হলো।

কিন্তু বাংলায় তা হলো না। তাই পূর্ব বাংলায় এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতা চলতেই লাগল। তার কারণও অবশ্য ছিল। এতে লাভবান হলো পশ্চিমী মুসলমানরা। হিন্দুরা চলে গেলে তারা তাদের বাড়ি ঘর, জমি জায়গা সব দখল করে নিতে লাগল। সস্তায় বা বিনা পয়সায় তারা পেতে লাগল কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। তারা এদেশ থেকে গিয়ে ভারতে মুসলমানদের উপরে অত্যাচারের নানা কাল্পনিক কাহিনী বলে বাঙালী মুসলমানদের উত্তেজিত করতে লাগল।

এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার ভূত এসে চেপে বসল সারা পূর্ব পাকিস্তানের উপরে। আর এতে সব চেয়ে বেশি লাভবান হলো পশ্চিমী মুসলমানরা। তাদের এতে হলো যেন পোয়াবারো। তারা হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে সেই সব জায়গায় বড় বড় বাড়ি, মিল ফ্যাক্টরি সব বসাতে লাগল।

সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ ভূতকে লেলিয়ে দিয়ে এইভাবে দূরাগত

পশ্চিমীরা এসে চেপে বসল পূর্ববাংলার দরিদ্র বাঙালীদের কাঁধের উপরে। এটাই তারা চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যই ত তাদের এই পাকিস্তান সৃষ্টি করা। তাই তারা মহাখুশী।

কিন্তু এইভাবে বেশিদিন চলল না।

ধীরে ধীরে পূর্ববাংলার বাঙালী মুসলমানরা শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগল। তারা দেখল যে দেশ স্বাধীন হলো বটে, হিন্দু উৎখাতও হলো, কিন্তু তাতে তাদের কি এমন লাভ হলো?

বাঙালী গরীব চাষীরা দেখতে পেলো দীর্ঘ বিশ বছরেও তাদের চাষবাসের ব্যবস্থার কোনও উন্নতি হলো না। তাদের নেই ভাল সার, নেই ট্রাক্টর। সেই মান্ধাতার আমলের বলদের লাঙল দিয়ে তারা চাষ করে। সেই মান্ধাতার আমলের মত জলে ভিজতে হয়, রোদে পুড়তে হয় তাদের। তাদের পেটে নেই অন্ন—তাদের পরণে নেই বস্ত্র। চাষী মজুর প্রভৃতির একই দশা।

কিন্তু তাদের চোখের সামনে পশ্চিমীরা এসে বড় বড় সব আলো ঝলমল বাড়ি, দোকান কলকারখানা তৈরি করছে। তাদের সুখ সুবিধার অন্ত নেই।

তারা তেতে পুড়ে যে ফসল ফলাচ্ছে তার বেশির ভাগ চলে যাচ্ছে পশ্চিমে। তাতে তাদের পেট ভরছে। তাদের সৃষ্ট চা, চাল, পাট বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। মিলছে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। কিন্তু সে মুদ্রা ভোগ করছে লাহোর, করাচীর ধনী মুসলমানরা।

পাকিস্তানের মোট উপার্জন যা হয় রেভিনিউ হিসাবে তার শতকরা ৬০ ভাগ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় হয়—তা যায় পশ্চিমীদের হাতে। বাকি ৩০ ভাগ ব্যয় করে কেন্দ্রীয় সরকার—তাও যায় পশ্চিমে। অবশিষ্ট ৩০ ভাগের জন্যে মাত্র ৪।৫ ভাগ খরচ হয় পূর্ব বাংলার উন্নয়নের জন্য।

পাকিস্তানের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, অস্ত্র তৈরীর

কারখানা প্রভৃতি সব পশ্চিমে। তাই দেশরক্ষা খাতে যে ৬০ ভাগ খরচ হয় তা সব যায় ঐ সব পশ্চিমীদেরই পকেটে।

এইভাবে দিনের পর দিন শোষণে শোষণে পূর্ব বাংলা হচ্ছে নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা।

এই সব হিসাব দেখিয়ে দিলেন জনসাধারণকে নবসৃষ্ট পার্টি আওয়ামী লীগ যাদের নেতা হলেন শেখ মুজিবর রহমান।

তিনি দেখালেন যে ঃ

( ) পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা যা আয় হয় তার ৭০ ভাগেরও বেশি পায় পশ্চিম পাকিস্তান।

(২) পাকিস্তান সরকারের উপার্জিত অর্থের প্রায় শতকরা ৯৪ ভাগ পশ্চিমের জন্য খরচ করা হয়ে থাকে।

(৩) পাকিস্তানের সরকারী চাকরীর শতকরা ৭০।৭৫ ভাগ পাচ্ছে পশ্চিমীরা।

(৪) একমাত্র পূর্ব বাংলায় ধান উৎপন্ন হয় সারা পাকিস্তানে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় যখন চালের দাম হয় এক টাকা পাঁচ সিকা সের, তখন করাচীতে তার দাম হয় বারো আনা সের।

৫। পূর্ব বাংলায় সোনার দাম যখন ১৮০ টাকা ভরি, তখন পশ্চিমে সোনার দাম হয় ১৩০ টাকা ভরি।

৬। দুই পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব বাংলার লোকসংখ্যা মোট পাকিস্তানের শতকরা ৫৫ ভাগ। কিন্তু মিলিটারীতে পশ্চিমীরা চাকরী পায় শতকরা ৭৫ বা ৮০ ভাগ—বাঙালীরা পায় মাত্র ২০।২৫ ভাগ।

সর্বত্রই চলেছে পশ্চিমীদের এমনি বিমাতৃসুলভ আচরণ।

পশ্চিম পাকিস্তান রুক্ষ মরুভূমি বা পর্বতে সমাকীর্ণ। একমাত্র পশ্চিম পাঞ্জাবের সামান্য গম ছাড়া সেখানে শস্য যা হয় তাতে তাদের অর্থাৎ মোট পাকিস্তানের ৬ মাস চলে না। অথচ বাংলাকে এইভাবে

শোষণ করে তারা বেশ সুখে রাজার হালে আছে—অথচ বাঙালীর সেই ভাত-কাপড়, সুজলা সুফলা বাংলার আজ এই দুরবস্থা।

* * *

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হলো বাঙালীদের এই দাবী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই। মুস্লিম লীগের প্রতি তখন ধীরে ধীরে জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা কমে যেতে লাগল। তারা দেখলো, মুসলীম লীগ সৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে কেবল বাঙালীকে ধ্বংস করার জন্যেই—তাছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে নয়।

তারা বলে, আমরা সবাই এক—আমরা মুসলমান। তাহলে বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে তাদের এই বিরাট বৈষম্য কেন? আসলে তারা পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি কলোনি সৃষ্টি করতে চায়। তাছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাদের নেই—তা থাকতে পারে না তাদের। কারণ জিন্নার উদ্দেশ্যও ছিল তাই।

এইভাবে ধীরে ধীরে মুসলীম লীগের প্রতি জনগণের আস্থা যত কমে যেতে লাগল, ততো মুসলীম লীগ আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে মাঝে মাঝে চালাতে লাগল নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ঐটিই ত একমাত্র পথ।

কিন্তু তাতে সব বাঙালী বুঝল না। তাদের মধ্যে তখন নবজাগরণ শুরু হয়েছে। তা সৃষ্টি করেছেন বাংলার প্রধান নেতা- শেখ মুজিবর রহমান আর মৌলানা ভাসানি। দুজনেই বুঝেছেন গরীব বাঙালীদের দুর্দশা—দুঃখ-কষ্ট। তাই তাঁরা বাঙালীদের সামনে জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছেন।

হিন্দু নির্যাতন, দাঙ্গা হাঙ্গমা সৃষ্টি প্রভৃতি সবই যে পশ্চিমীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তা ধীরে ধীরে বুঝতে সুরু করল বাঙালী মুসলমান।

৩

ব্রহ্মপুত্র পদ্মা আর মেঘনা
ইছামতী ধলেশ্বরী যমুনা
দুই তীর তার উঠলো জেগে
নতুন ঊষার পরশ পেয়ে।
বাঙালীর দাবী হলো সোচ্চার
নতুন প্রাণেরা আসলো ধেয়ে ॥”

বাঙালীর এই চেতনা, এই জ্ঞান, এই আত্ম জিজ্ঞাসা, এই চিন্তাধারা একদিনে আসেনি। এর জন্যে ধীরে ধীরে জাতিকে প্রস্তুত করতে হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে অবশ্য অত্যাচারের অভাব হয়নি। সমানে চলেছে অত্যাচার। যারা বাঙালীর কথা বলতে চেয়েছে, পাকিস্তান সরকার তাদেরই দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে। তাদেরই ভাগ্যে জুটেছে নির্যাতন—জুটেছে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড। কেউ বা কারাগারেই প্রাণ দিয়েছে পাকিস্তানী পুলিশ বা মিলিটারীর বুলেটে। কিন্তু প্রাণ দিয়েও তারা তাদের দাবী ত্যাগ করেনি।

শুধু যে পুরুষের উপরে অত্যাচার হয়েছে তাই নয়। সে অত্যাচার থেকে বাদ যায়নি নারীও। নাচোল মামলায় কৃষক বিদ্রোহের সময় কম্যুনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র ধরা পড়ে পাকস্তানী পুলিশের হাতে। তাঁর উপরে চলে প্রচণ্ড দৈহিক নির্যাতন। তিনি অনেক কষ্টে মুক্তি পেয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় চলে আসেন ভারতে।

এছাড়া বহু তরুণ যুবককে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলের মধ্যে গুলি করে মারা হয়েছে। কাউকে বা হত্যা করা হয়েছে প্রকাশ্যভাবে। সে ইতিহাস বলতে গেলে বিরাট এক মহাভারত হয়ে যায়।

কিন্তু অত্যাচার যেখানে যত বেশি, মানুষের মনোবল সেখানে হয় তত দৃঢ়। তাই মনোবল দিন দিন বেড়ে চলে। যতো চক্রান্তই চলুক আওয়ামী লীগ প্রভৃতি পার্টির প্রচারকার্য বন্ধ হয় না।

এর মধ্যেই দেখতে দেখতে এসে গেল ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলনে নতুন করে জেগে উঠল বাংলার যুবক, বাংলার তরুণ সমাজ, ছাত্র সমাজ। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তারা চিনতে পারলো পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রকৃত স্বরূপ।

* * *

'আ-মরি বাংলা ভাষা।
মোদের গরব, মোদের আশা,
আ-মরি বাংলা ভাষা।
কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
এ গানেই নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।'

সারা পৃথিবীর সব ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা একটি অমূল্য সম্পদ। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বে একমাত্র ইংরাজী ছাড়া এত সমৃদ্ধিশালী ভাষা আর দ্বিতীয় নেই।

এই বাংলাভাষার সঙ্গে বাঙালীর যেন নাড়ীর টান—যেন অন্তরের যোগাযোগ। বাঙালী প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তার এই ভাষাকে। সেখানে হিন্দু মুসলমান জাতিভেদ নেই। এই মিথ্যা জাতিভেদের ব্যাপ্তির চেয়েও বাঙালীর হৃদয়ে বাংলা ভাষার প্রতি টান বেশি।

সারা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে যা লোকসংখ্যা তার মধ্যে শতকরা ৫৫ জন বাংলা ভাষায় কথা বলত। কিন্তু মহম্মদ আলী জিন্না

ঘোষণা করলেন পূব পশ্চিম মিলিয়ে সারা পাকিস্তানের ভাষা হবে উর্দু ভাষা। বাঙালী মুসলমানকে সরকারী কাজকর্ম সব করতে হবে উর্দু ভাষায়।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠল বাঙ্গালী জাতি। না, তাদের যতোই ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানী করার চেষ্টা করা হোক, বাংলা ভাষা তারা ত্যাগ করবে না—কিছুতেই না। এ অসম্ভব।

এসময় জিন্না সাহেব এলেন ঢাকা সফরে। তার এক মিটিংএ তার মুখের ওপরে প্রকাশ্যভাবে কতকগুলি ছাত্র দাবী করল, বাংলা ভাষা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

জিন্না সাহেব ত রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি হলেন কায়েদে আজম! তাঁর মুখের উপরে বাচ্চা বাঙালী ছোকরারা কথা বলতে সাহস পায়!

জিন্না সাহেব সোজা বলে দিলেন—না, তা হবে না।

কিন্তু তিনি চলে গেলেও আন্দোলন থামল না। সারা পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ পথে বের হলো পরদিন বিরাট এক মিছিল করে। তাদের এক দাবী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার বুকে চলল গুলি। সে গুলিতে কতো তরুণ যুবক প্রাণ দিল। শহীদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠল ঢাকার রাজপথ। কিন্তু তবু তাদের এই আন্দোলন বন্ধ হলো না। তা চলতেই লাগল।

পরদিন আবার সারা পূর্ব বাংলার ছাত্ররা দলে দলে বের হলো পথে মিছিল করে। তাদের মুখে মুখে ধ্বনিত হচ্ছে বাংলা গান। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গান—

> 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
> পার হতে হবে রাত্রি নিশীথে
> যাত্রীরা হুঁসিয়ার।'

ক্ষেপে উঠল সরকার। পরদিন আবার বিভিন্ন জায়গায় চলল

গুলি। কত তরুণ মারা গেল। সেলিম, বরকত প্রভৃতির রক্তে সিক্ত হলো মাটি। কিন্তু তবু স্তব্ধ করা গেল না আন্দোলন।

অবশেষে তার গেল করাচীর বড় বড় কর্তাদের কাছে। তাঁরা দেখলেন ভাষা আন্দোলনকে মেনে না নিলে বাংলা দেশে শোষণের কৌশল ধ্বংস হবে। তারা তখন সান্ত্বনা দিলেন—ঠিক আছে উর্দু আর বাংলা দুটিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

এইভাবে বাঙালী যুবকরা তাদের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করল। বাংলা ভাষার দাবী হলো সফল। তবে তাদের মনে উঠল নতুন এক প্রশ্ন। ভাষা আর সংস্কৃতিই বড় না ধর্ম বড় ?

* * *

দেখতে দেখতে এসে গেল পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন করার সময়। সারা পাকিস্তানে নির্বান হবে। নির্বাচন হবে পূর্বে ও পশ্চিমে একসঙ্গে। সারা পূববাংলা মেতে উঠল, এই নতুন নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে।

এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে সব পার্টিগুলি ছিল তারা একত্রিত হয়ে নতুন এক দল গঠন করল। সেই দলের নাম হলো যুক্তফ্রন্ট বা জয়েন্ট ফ্রন্ট।

এই জয়েন্ট ফ্রন্টের নেতা হলেন শের-ই-বাঙাল জনাব ফজলুল হক সাহেব। তার দক্ষিণ হস্ত হলেন আওয়ামী লীগ নেতা নতুন যুবক শেখ মুজিবর রহমান।

দিকে দিকে চলতে লাগল প্রচার কার্য—চলতে লাগল এই নব আন্দোলন—পশ্চিমীদের শোষণ চলবে না। বাংলাদেশের মানুষকে খেয়ে পরে বাঁচার অধিকার দিতে হবেই। এই আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল পূর্ব বাংলা।

পূর্ববাংলার মানুষ এতদিনে বুঝতে পেরেছে তাদের ভুল।

সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির ফলে কি নির্যাতন তাদের সহ্য করতে হয়েছে তা বুঝতে পারল বাঙালী মুসলমান হিন্দু নির্বিশেষে। তারা তাই আজ একতাবদ্ধ। তাদের দাবী তারা ভোটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

সারা পূর্ববাংলার নির্বাচনের ফলাফল তাই হলো বিস্ময়কর। দেখা গেল জয়েন্ট ফ্রন্ট শতকরা ৯০টির বেশি আসন দখল করেছে। মুসলীম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে এই নির্বাচনে।

জনাব ফজলুল হক হলেন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তিনি তখন জানতেও পারেননি তাঁর এই মুখ্যমন্ত্রীত্ব কত ক্ষণস্থায়ী। সামনে আসছে বিরাট বিপদ। সে বিপদে তিনি পড়তে বাধ্য—কারণ পশ্চিমীরা এত সহজে তাদের এই শোষণস্তব্ধ হতে দেবেনা। বাংলাকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে তারা রাজী নয়।

৪

'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু
নিভাইছে তব আলো।
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ
তুমি কি বেসেছো ভালো ?'

নির্বাচন শেষ হবার কয়েক দিন পরেই জনাব ফজলুল হক আসেন পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসার জন্য। তাঁর রোগ আর কিছুই নয়—পায়ের ব্যথা। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি একটা মিছিলে যোগ দেন। তার ফলে পুলিশের লাঠি পড়ে তাঁর পায়ে। চিকিৎসা করেও সম্পূর্ণ সারেনা—তবে ব্যথা কমে গেছিল। সেই বাথা আবার খুব বেড়ে যায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে আসতে হয় পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা করাবার জন্যে।

তাঁর বন্ধু ছিলেন তখন বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনিই তখন ছিলেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী। হক সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে মনুস্থ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে এসে বিমানঘাটিতে নেমেই তিনি একটি বক্তৃতা দেন। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ হকসাহেবের এই সাফল্যের জন্য তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। বৃটিশ আমলে যুক্তবঙ্গে তিনিই ছিলেন যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী। তাই পশ্চিমবাংলার মানুষও তাঁকে ভালবাসত। তারা তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

এই বিরাট অভিনন্দনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেন ঃ

আমি আজ যে পদ লাভ করেছি, তার যা সুফল তা আমরা একা ভোগ করব না। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সমান ভাবে ভাগ করে নেবো। পশ্চিমবাংলায় আছে আমার অনেক বন্ধু। এই কোলকাতা সহরেই আমি আমার জীবনের সুদীর্ঘ অংশ কাটিয়েছি। তাই বাংলার এই বিভাগ—দুই বাংলার মধ্যে বিভেদের প্রাচীর আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না। দুই বাংলার মধ্যেকার মতের অনৈক্য আমি দূর করতে প্রয়াসী হবো। আমার বন্ধু মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমি দেখা করব ও এবিষয়ে আলোচনা করব। ইনশাল্লা আমি সফল হবোই।

পরদিনই রাইটার্স বিল্ডিং-এ তিনি দেখা করেন ডাঃ রায়ের সঙ্গে। দুই বন্ধুতে বহুদিন পরে দেখা। দুজনে অনেক কথা হলো। হক সাহেবের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন ডঃ রায়। তারপর দুজনে দুই বাংলার নানা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা হলো।

তাঁদের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল দুই বাংলার মধ্যে ভিসা পাশপোর্ট ব্যবস্থা শিথিল করা—দুই বাংলায় সহজে যাতে যাতায়াত করা যায়। আর দুই বাংলার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চালু করার ইচ্ছাও ছিল হক সাহেবের।

দুজনের কথাবার্তার পর হক সাহেব বিদায় নিলেন। পরদিন তিনি একটি ভোজ সভায় নিমন্ত্রিত হন ও প্রচুর সম্মান লাভ করেন। এই ভোজসভায় হক সাহেব বলেন :

আজ দুই বাংলার মধ্যে বিরাট এক বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে—অথচ দুই বাংলার মানুষই বাঙালী। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আছে একটা আত্মার টান-একটা নাড়ির টান। আমি চাই আমাদের মধ্যেকার এই বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে সহজভাবে যাতায়াত ও মেলামেশার ব্যবস্থা করতে। এতে দুই বাংলাই হবে উন্নত শক্তিশালী ও উপকৃত। ইনশাল্লা আমার এ প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

কয়েকদিন এইভাবে মহানন্দে কোলকাতায় কাটালেন হক্ সাহেব। বিদায় নেবার সময় তিনি তার বন্ধু ও অনুরাগীদের বললেন :

আমি কোলকাতা থেকে আজ বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু কোলকাতায় আমার বন্ধু, আত্মীয় ও অনুরাগীদের প্রতি আমার আছে অন্তরের যোগাযোগ। আমি বিদায় নিচ্ছি বটে, তবে মন আমার এখানেই পড়ে থাকবে। ইন্‌সাল্লা আমি আবার আসব এখানে।

হক্ সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু ঢাকায় ফিরে তিনি যে ঘটনার সামনে পড়লেন তার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

হক্ সাহেব এমন কিছুই বলেননি, যাতে পাকিস্তান বা পূর্ব-পাকিস্তান ধ্বংস হয়। তবে তিনি চেয়েছিলেন মাত্র বাঙালী জাতির উন্নতি। ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না তার মধ্যে।

কিন্তু বাঙালীর উন্নতির কথা শুনলেই পশ্চিম পাকিস্তান শাসকদের পিলে চমকে ওঠে। তিনি গিয়েই শুনলেন—তারা বলেছেন যে তিনি নাকি কোলকাতার বিভিন্ন বক্তৃতায় যা বলেছেন তা দেশের পক্ষে মহা হানিকর। তিনি নাকি পাকিস্তানের পয়লা নম্বরের দুষমণ। তাই তাঁকে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী রাখা চলে না। তাকে সত্বর করাচীতে যাবার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে।

পীড়িত, বিরক্ত মন নিয়ে হক সাহেব গেলেন করাচী। সঙ্গে সঙ্গে চললেন তাঁর দক্ষিণ হস্ত তরুণ যুবক মুজিবর।

হকসাহেব করাচীতে গিয়ে সেখানকার বড় বড় সব নেতাদের সঙ্গে অনেক আলোচনা করলেন। অনেক তর্কও করলেন। পূর্ববাংলার ধ্বংস তিনি চাননি—এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু তাঁর কথা শোনা হলো না। তাঁকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হলো।

করাচী থেকে ফিরে ঢাকা যাবার পথে হক্ সাহেব কয়েক মিনিট ছিলেন দমদম বিমান ঘাটিতে। সেখানে অনেক সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে ধরল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিবরও।

হক্ সাহেব মুখে আঙুল দিয়ে ইশারায় শুধু বললেন—আমার মুখ বন্ধ।

হক্ সাহেব সেই যে গেলেন তারপর পশ্চিমবঙ্গে আর পদার্পণ করেননি। ঢাকায় ফিরে তিনি হলেন অন্তরীণ। তারপর পূর্ববাংলায় শুরু হলো মিলিটারী গভর্ণর ইস্কান্দার মীরজার শাসন। এর কিছুদিন পরেই তিনি পরলোক গমন করেন।

কিন্তু তিনি আজও প্রতিটি বাঙালীর কাছে চির অমর। নির্বাচনের ফলে তিনি প্রথম বাংলার জন্য বাঙালীর মুখপাত্র হয়ে একমাস ছিলেন।

এই একমাসের মধ্যেই তাঁর সব কাজ হলো শেষ। তিনি শেষ পর্যন্ত পৃথিবী থেকেই চিরবিদায় নিলেন। কিন্তু মরেও তিনি চিরঅমর হয়ে বিরাজ করবেন প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে।

* * *

নির্বাচনী প্রহসন শেষ হলো। শুরু হলো আবার সেই গভর্ণর শাসন। কড়া শাসন। বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বললে বা দাবী করলেই তাকে বলা হয় দেশদ্রোহী। পাকিস্তানের সংহতির শত্রু। তার মানে বাঙালী জাতি অত্যাচারিত হতেই জন্মেছে। চিরদিন তারা সহ্য করবে সেই অত্যাচার। তারা হবে শোষিত, পশ্চিমীরা তেমনি রাজত্ব করতে চায় চিরদিন ধরে।

কিন্তু এরমধ্যেও আবার আওয়ামী লীগের আন্দোলন জোর চলতে লাগল। করাচীতেও এলো পরিবর্তন। সেখানে ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা দখল করল। স্বল্প সময় তারা সেখানে রাজত্ব করেছিল বটে—তবে তার মধ্যেই তারা সংবিধান রচনা করে। দেশের উন্নতির জন্যেও অনেক চেষ্টা করে তারা।

অবশ্য বেশিদিন এভাবে চালানো গেল না। আবার বিপরীত পক্ষ এসে জোর করে ক্ষমতা কেড়ে নিলে। অবশেষে গভর্ণর

জেনারেল হলেন ইস্কান্দার মীরজা—যিনি খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

কেন্দ্রের শাসনে চলতে লাগল নিত্য নতুন পার্টির জন্মলাভ।

অবশেষে একদিন হঠাৎ পাকিস্তান মিলিটারীর প্রধান জেনারেল আয়ুব খাঁ জোর করে ক্ষমতা দখল করে নিলেন। তিনি ইস্কান্দার মীরজাকে গ্রেপ্তার করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ইংলণ্ডে। তিনি আজও সেখানে একজন হোটেলের মালিক হয়ে আছেন। আয়ুব খাঁ হলেন প্রেসিডেন্ট। বড় বড় নেতাদের ধরে কারাগারে পোরা হলো।

সেই পশ্চিমী জুলুম আবার শুরু হলো নবরূপে—নতুনভাবে। তবে এবারকার দাপট অনেক বেশি—কারণ এবার যে সেখানে চলেছে পূর্ণভাবে মিলিটারী শাসন।

পূর্ববঙ্গের সব আন্দোলনও বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করলেন আইয়ুব প্রাণপণে। বাঙালার আন্দোলন কিছু নয় বলে ভাবলেন আইয়ুব, ওকে সহজেই ঠাণ্ডা করা যাবে। শুধু চাই একটু ভয় দেখান বা চোখ রাঙানো—ব্যস্।

এই রকমই ছিল তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁর ধারণা। কিন্তু তাঁর সে ধারণা প্রথমটা সফলও হয়েছিল। তার কারণ মিলিটারী শাসন এর আগে কেউ কখনো দেখেনি, তাই তার ভয়ে একেবারে সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

৫

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট,
অত্যাচারীর রক্তে গড়া পাষাণবেদী।
আরে ও পাগ্‌লা ভোলা
জ্বালা তোর আগুন জ্বালা
উঠুক ঐ অগ্নিশিখা, গগন ভেদী।'

প্রেসিডেন্ট বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন জেনারেল আয়ুব খাঁ। ঘোষণা করেই তিনি নতুনভাবে এক বিরাট ঘোষণা করলেন জাতির উদ্দেশ্যে।

তিনি জানালেন যে, তিনি পাকিস্তানের এক নতুন উদ্ধারকর্তার ভূমিকা নিয়ে এসেছেন। তিনি পাকিস্তানের বুক থেকে এতদিনের অন্যায়, অত্যাচার দুর্নীতি সব দূর করবেন। তিনি গরীবদের মুখে ফুটিয়ে তুলবেন হাসি। তাঁর শাসনকালে চলবে না কোনও কালো-বাজার, চলবে না অন্যায়ভাবে লোককে শোষণ করা, চলবে না সংখ্যা-লঘুদের উপরে কোনও রকম নির্যাতন।

তিনি মিলিটারী শাসক—তাই কড়া ব্যবস্থা নিয়ে সব অন্যায় দমন করবেন।

অবশ্য আইয়ুব খাঁ শাসনভার গ্রহণ করেই কড়াভাবে জনসাধারণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলেন। তিনি কালোবাজারীদের ধরে রাস্তার উপরে দাঁড় করিয়ে বেত মারলেন, চোরাকারবারীদের ধরে ধরে খালি পায়ে রোদ্দুরে মার্চ করলেন। কালোবাজারীরা তাদের

অতিরিক্ত মালপত্র গোপনে নষ্ট করে ফেলতে লাগল। বুড়িগঙ্গার বুকের উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল কয়েক টন সরষের তেল আর ঘি।

জনসাধারণ ভাবল, সত্যিই বোধ হয় আইয়ুব খাঁ তাদের এক উদ্ধারকর্তা।

আইয়ুব খাঁর কড়া হুকুম, কোনও রকম ঘুষ নেওয়া চলবে না— চলতে পারে না। তা ধরা পড়লে কঠোর দণ্ড ও বেত্রাঘাত লাভ করতে হবে। কোনও রকম বেআইনি কাজ সহ্য করবেন না আইয়ুব খাঁ সরকার।

যাই হোক, পাকিস্তানের ভোল অনেকটা পালটে ফেলার চেষ্টা করলেন আইয়ুব খাঁ। কিন্তু তা যে কত ক্ষণস্থায়ী তা লোকে বুঝতে পারলো কিছুদিন পরেই।

আইয়ুব খাঁ নিয়ম জারী করে দিলেন প্রতিটি দোকানে, প্রতিটি ঘরে তাঁর ছবি টাঙিয়ে রাখতে হবে। তা না হলে ক্ষমা করবে না মিলিটারী সরকার। এইভাবে নিজের চতুর্দিকে তিনি একটা ত্রাস ও ভয়ের প্রাচীর সৃষ্টি করে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করার প্রয়াস পেলেন।

কিন্তু এর পরেই লোকে ধীরে ধীরে দু চার বছর পরে যখন ভাল করে বুঝতে শিখলো, তখন তারা দেখলো তাদের অবস্থার উন্নতি বিশেষ কিছুই হয়নি। দু চারটে অন্যায়কারী বা কালোবাজারী শাস্তি পেলেই ত আর সরকারী কাঠামো পালটে যাবে না। সব কিছু চলছে ঠিক আগের মতোই।

পশ্চিমে যাচ্ছে বাংলার সব সম্পদ। পশ্চিম ঠিক আগের মতোই সুখে আছে। আর বাংলার বুকে চলছে ঠিক সেই অভাব, অনটন, দুঃখ। হয়তো জিনিষপত্রের দাম দু এক আনা কমেছে, কিন্তু তাতে এই ভয়ানক দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে না।

ফলে ধীরে ধীরে আইয়ুব খাঁর উপরেও লোকে বিরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু আন্দোলন করতে তারা প্রথমটা ভয় পেলো। কারণ তারা জানতো, এটা মিলিটারী সরকার। বেশি কিছু বলতে গেলে গুলি খেয়ে মরতে হবে।

কিন্তু ধীরে ধীরে অভাবে অনটনে লোকের ভয় কমে এলো। তারা তখন দাবী করল বাঙালীর দাবী মানতে হবে। মিলিটারী শাসন চলবে না। গণতন্ত্র চাই। পূর্ব বাংলার জন্যে চাই বাঙালীর শাসন।

প্রথমটা আইয়ুব খাঁ ভয় পেলেন না। তিনি ভাবলেন যে, জোর করে, অত্যাচার করে সব তিনি দমিয়ে দেবেন। সে চেষ্টাও তিনি করলেন। কিন্তু ফল হলো না তাতে। কারণ পূর্বের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের লোক ও নেতৃবৃন্দও দাবী করল যে, নির্বাচন চাই। গণতন্ত্র চাই। এভাবে তারা চিরদিন এই অত্যাচারী মিলিটারী সরকারের অধীনে থাকতে রাজী নয়।

কিন্তু তাদের এই দাবী করার মাঝখানেই কেটে গেছে আইয়ুবের চার পাঁচ বছর রাজত্ব।

আইয়ুব তখন তুললেন কাশ্মীরের জিগীর, ভারত বিদ্বেষের জিগীর আর সাম্প্রদায়িক চীৎকার। এই সব ভাবেই যে আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা যায়, তা আইয়ুব খাঁ শিখে গেছেন তাঁর পূর্বতন সব নেতাদের কাছ থেকে। এই নীতিতে পশ্চিমী শাসকরা বেশ সিদ্ধহস্ত।

কিন্তু এই নীতি আর চলল্যে না। কারণ ইতিমধ্যেই নানাভাবে লোকে অনেকটা বুঝতে শিখেছে। জনসাধারণ আজ অনেকটা বুদ্ধিমান। তারা তাদের দাবীতে অটল রইলো। নির্বাচন চাই।

পশ্চিমী শাসক হলেও আইয়ুব খাঁ ছিলেন বুদ্ধিমান। তিনি বললেন—জনসাধারণ এখনো ততটা নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুত হয়নি—দেশের লোক কি করে প্রকৃত নেতাকে ভোট দেবে ? তাই তিনি এখন সাধারণ নির্বাচন করবেন না। তবে দেশের শতকরা ২।৪ ভাগ

শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকদের তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার দেবেন।

আইয়ুব খাঁ এদের নাম দিলেন Basic Democrat বা মৌলিক গণতন্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন লোক। এঁরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন। আইয়ুবের এই নতুন আইনের নাম হলো Basic Democracy বা মৌলিক অধিকার।

আইয়ুব খাঁ বেছে বেছে তাঁর সহায়ক সব খয়ের খাঁ লোকদের দলে টানলেন। তারাই নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকার পাবে। এরা হয় মোল্লা মৌলভী, উগ্র ধর্মবাদী না হয় পশ্চিমীদের পদলেহী মীরজাফর।

আইয়ুব খাঁ এদের একটা তালিকা তৈরী করলেন পূবে ও পশ্চিমে। এরাই ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবে।

আইয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ালেন জিন্না সাহেবের বোন মিস্ ফতিমা জিন্না। কিন্তু দাঁড়ালে কি হবে—আইয়ুব স্থির জানতেন তিনি নির্বাচনে জয়ী হবেন।

হলোও তাই। আবার যে নির্বাচন হলো তাতে জনগণ দলে দলে মিস্ জিন্নাকে সমর্থন করলেও নির্বাচনে আইয়ুবের জয় হলো। তিনি আবার চালালেন তাঁর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার।

কিন্তু বেশিদিন এইভাবে অত্যাচার চালানো সম্ভব হলো না। কারণ আইয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে আবার জনগণ বিদ্রোহ করতে লাগল। চলতে লাগল আন্দোলন। আইয়ুব খাঁ দেখলেন মহা বিপদ। কোনও ওষুধেই কাজ হচ্ছে না—এমন কি সাম্প্রদায়িক জিগীর, হিন্দু নিধন সব কিছু ব্যর্থ হচ্ছে।

তিনি তখন ভারতের নানা অংশ আক্রমণ করে যুদ্ধ বাধাতে চেষ্টা করলেন ভারতের সঙ্গে। আক্রান্ত হলো কচ্ছের রান অঞ্চল, আক্রান্ত হলো কাশ্মীর।

ভারত তখন তার নিরাপত্তার জন্যে পশ্চিম সীমান্তে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করল। দুপক্ষে লড়াই শুরু হতেই আইয়ুব প্রচার করতে লাগল, ভারত বড় সাংঘাতিক দেশ। এ সময় সব আন্দোলন বন্ধ রাখা অবশ্য কর্তব্য। এইভাবে আইয়ুব সব কিছুর মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করলেন।

যুদ্ধে পাকিস্তান পরাজিত হলেও তাসখন্দ চুক্তি অনুযায়ী আইয়ুব আবার সব কিছুই ফেরৎ পেলেন। কিন্তু সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ রইলো।

এইভাবে আইয়ুব খাঁ সাময়িকভাবে আন্দোলন ধামা চাপা দিলেও তা বেশিদিন ধামা চাপা রইলো না। কারণ এই আন্দোলনের প্রধান নেতারা তখনো জীবিত।

* * *

আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর জন্ম ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায়। তাঁর পিতা ছিলেন আদালতের সেরেস্তাদার।

মুজিবর প্রথম জীবনে লেখাপড়া শেখেন গোপালগঞ্জে—তারপর তিনি পড়তেন কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে। তখন দেশ অবিভক্ত ছিল —স্বাধীনতাও আসেনি।

ছাত্র জীবনেই তিনি জড়িয়ে পড়েন রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে। তিনি দেশকে ভালবাসতেন। কিন্তু সে সময় হিন্দু মুসলীম বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা দেখে রাজনীতি তাঁর ভাল লাগত না।

বি. এ. পাশ করে তিনি আইন পড়তে থাকেন। কিন্তু আইন পড়া শেষ হলো না। তার আগেই দেশবিভাগ হয়ে গেল। তিনি পুরোপুরি রাজনীতিতে যোগ দিলেন। সবার আগে তিনি মৌলানা ভাসানির সঙ্গে যোগ দেন আওয়ামী লীগে। তখন সুরাবর্দী সাহেব আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার পরে ভাসানী সাহেব

আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে কৃষকদের নিয়ে চীনপন্থী ন্যাশন্যাল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

মুজিবর কিন্তু আওয়ামী লীগেই থাকেন। তখন ফজলুল হক সাহেব যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী হন, তখনও মুজিবর ছিলেন তাঁর সহকর্মী। তিনি তখন থেকে বাংলা দেশের জাতীয় আন্দোলনের জন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে আসছেন।

ফজলুল হক ও ভাসানী উভয়েই ভালবাসতেন এই তরুণটিকে। তাঁর দেশাত্মবোধ, তাঁর জাতীয়তা অর্থাৎ স্বজাতি প্রিয়তা ছিল অপরিসীম—তাই সব নেতাই তাঁকে খুব ভালবাসতেন।

কিন্তু আইয়ুব খাঁর নির্বাচনের সময় মুজিবর রহমান মিস্ ফতিমা জিন্নাকেই সমর্থন করেন। তাই তিনি পড়ে যান আইয়ুব খাঁর বিষদৃষ্টিতে। আইয়ুব খাঁ তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না।

তারপর পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ও মুজিবর আইয়ুবকে সমর্থন করেননি; তিনি বলেন যে বাঙালী হিসাবে তিনি এ যুদ্ধ বা গোলমাল পছন্দ করেন না। বাংলার উন্নতি এতে ব্যাহত হবে।

তখন থেকেই আইয়ুব খাঁ ভাবতে থাকেন কি করে এই দুর্বিনীত নেতাকে জব্দ করা যায়। যুদ্ধ মিটে গেল। মুজিবর আবার আন্দোলন শুরু করে দিলেন। নির্বাচন চাই—চাই বাঙালীর বাঁচার প্রকৃত অধিকার। চাই বাঙালীর উপযুক্ত উন্নতি। Basic গণতন্ত্র একটা ভাঁওতা মাত্র। আসল গণতন্ত্র হলো প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের অধিকার। সেটা তাঁর চাই।

এই দাবীতে অবশ্য মুজিবর পশ্চিমী নেতাদেরও খুব সমর্থন পেলেন। কারণ তখন সব নেতাই বলেছিল এক কথা—তাঁরা নির্বাচন চান। নির্বাচন না হলে কোন উন্নতি হবে না দেশের।

আইয়ুব খাঁ তখন জোর করে এই আন্দোলন দমিয়ে রাখেন। এমন কি তিনি সুরাবর্দীকে পর্যন্ত জেলে আটকে রাখেন। পরে অবশ্য

তাঁর মৃত্যু হয়। কাশ্মীর জিগীরের মূল নেতা, আইয়ুবের পেয়ারের দোস্ত ভুট্টো পর্যন্ত নির্বাচন দাবী করার জন্যে আইয়ুবের কোপদৃষ্টি থেকে বাদ পড়েননি।

* * * *

প্রথম থেকেই আইয়ুবের মনের কথা ছিল, যে করেই হোক না কেন মুজিবকে দমন করতে হবে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা সাজাতে লাগলেন।

পুলিশ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে—বিচারে তিনি ছাড়া পেয়ে যান। আবার অন্য এক জায়গায় মামলা উঠল, মুজিব গ্রেপ্তার হলেন। আবার বিচারক তাঁকে বেকসুর খালাস দিলেন।

এইভাবে চলল মাসের পর মাস।

অবশেষে একজন বিচারক তাঁর রায়ে কঠোর মন্তব্য করলেন। তিনি লিখলেন—এভাবে একজন নেতাকে দিনের পর দিন ধরে নির্যাতন করা ও বিনা বিচারে বিভিন্ন কারাগারে প্রেরণ করা ঘোর অন্যায়।

আইয়ুব দেখলেন বিপদ। তিনি তখন সাজালেন এক বিখ্যাত মামলা। এই মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। এই মামলায় মুজিবর এবং আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার হন। তাঁদের উপরে কঠোর নির্যাতন করতে থাকে পুলিশ।

শেখ মুজিবরের উপরেও পুলিশ কম অত্যাচার করেনি। সেই সব অত্যাচারের বিস্তৃত কাহিনী ঘিরে বের হয় একখানা বই। তার নাম হলো 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা'। এই বইটি পাক সরকার বাজেয়াপ্ত করেন।

দিনের পর দিন প্রচণ্ড দৈহিক অত্যাচারেও মুজিবর বা তাঁর দলবল ভেঙে পড়েননি। তাঁদের মুখে শুধু এক কথা—আমরা কিছুতেই

বাংলার বাঁচার দাবী, বাঙালীর প্রাপ্য পাওনা আদায়ের দাবী ত্যাগ করতে রাজী নই।

* * *

এদিকে উত্তাল হয়ে উঠল জনগণের আন্দোলন। তাদের এক দাবী—পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন চাই। শেখ মুজিবরের মুক্তি চাই। আওয়ামী লীগ নেতাদের মুক্তি চাই।

আইয়ুব খাঁ প্রাণপণ চেষ্টা করেও দমাতে পারলেন না এই আন্দোলন। জনসাধারণের উপরে অত্যাচার চলতে থাকলেও তারা নির্ভীক, তারা বেপরোয়া।

অগত্যা আইয়ুব খাঁ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করলেন। শেখ মুজিবরকে আহ্বান জানালেন রাওয়ালপিণ্ডিতে।

পিণ্ডিতে আলোচনা হলো দুজনের।

অবশ্য আইয়ুব খাঁ নির্বাচন মেনে নিতে রাজী হলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের ছটি দাবী মেনে নিতে রাজী হলেন না। তাঁর কথা হলো এতে পাকিস্তানের ঐক্য নষ্ট হবে। পাকিস্তান ধ্বংস হবে।

যা হোক, আইয়ুব খাঁ যে কথা বলে মিথ্যা মামলা সাজিয়েছিলেন, তা হলো মুজিবর ভারতের এজেন্ট। সে দেশের শত্রু। সে পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চায়। সে কথা তাঁকে জনতার চাপে পড়ে প্রত্যাহার করে নিতে হলো।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেবার পর যেদিন মুজিব ঢাকায় ফেরেন, সেদিন তাঁর সে কি সম্বর্ধনা! সবার মুখে শেখ মুজিবরের জয়জয়াকার। ফুলে ফুলে তাঁর দেহ ভরে উঠল। তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

এদিকে বাংলাদেশের জনতা ভীষণভাবে অশান্ত হয়ে উঠছিল। তারা নানাস্থানে পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে ঝামেলা করছিল। বেশি করে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল ছাত্র সমাজ।

আইয়ুবের অনুরোধে মুজিবর বেতার ভাষণে জনতাকে শান্ত হতে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন—আমাদের লড়াই করতে হবে শান্তভাবে। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, জয় আমাদের হবেই। আপনারা শান্ত থাকুন—বেশি উত্তেজনা আন্দোলন নষ্ট করে।

যাই হোক, আইয়ুব মুজিবের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেন। বললেন যে তিনি নির্বাচন চান। তবে তিনি মুজিবরের সব দাবী নিয়ে এখন চিন্তা করতে চান না। নির্বাচনের পরে যা হোক ঠিক করা যাবে।

সকলেই শান্ত হলো। ভাবল, সত্যি এবার প্রেসিডেণ্ট আইয়ুব খাঁ নির্বাচন চাইছেন। জনগণের আন্দোলনের জয় হতে বাধ্য। তাই বাংলাদেশে আন্দোলন অনেকটা বন্ধ হলো।

কিন্তু জনগণ জানতেন না, আইয়ুব এই সুদীর্ঘ এগারো বছর দেশ শাসন করে তাঁর নিজের জন্য প্রচুর অর্থ অর্থাৎ আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। এবারে তিনি কি নতুন চাল চালবেন। আর যাই হোক, অত সহজে নির্বাচন মেনে নিয়ে পশ্চিমী স্বার্থকে আরব সাগরে ডুবিয়ে দিতে তিনি পারেন না। আর যাই হোক, তিনি একজন পশ্চিমী জেনারেল ত বটেই।

হলোও ঠিক তাই।

আইয়ুব খাঁ হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে তিনি তাঁর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। তাঁর বদলে তিনি কার্যভার দিচ্ছেন নতুন শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর ওপর।

অর্থাৎ নির্বাচনকে স্বীকার করে নিয়েও শেষ মুহূর্তে তিনি তা অস্বীকার করে বসলেন। নতুন শাসক এলেন আবার আর একজন জেনারেল তিনি হলেন জেনারেল ইয়াহিয়া। ইয়াহিয়া খাঁ আরও জবরদস্ত লোক। তিনি হলেন নাদিরশাহের বংশধর। তাই তাঁর

উপরে শাসন ভার তুলে দিয়ে আইয়ুব পিণ্ডি ত্যাগ করে চলে গেলেন অনেক দুরে—সীমান্ত প্রদেশের বর্ডারে।

আর ইয়াহিয়া খাঁ নতুন শাসক হয়েই আবার কঠোর কড়াকড়ি শুরু করে দিলেন। তিনি প্রমাণ করতে লাগলেন যে তিনি সত্যি অত্যাচারী দস্যু নাদিরশাহের বংশধরই বটে।

জনসাধারণ শুনেছিল নির্বাচন হবে। তারা বেশ শান্ত ছিল এতদিন। মিলিটারী শাসন বেশ শিথিল করে দিয়েছিলেন আইয়ুব খাঁ। মুজিবর প্রভৃতি নেতার সঙ্গে আলাপ করে তিনি বলেন যে এবার নিশ্চয়ই সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভিত্তিতে নির্বাচন হবে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে একি নির্মম পরিহাস। নির্বাচন হলো না। এলেন ইয়াহিয়া খাঁ। আবার এসে বসল আগের চেয়েও দ্বিগুণ সংখ্যায় মিলিটারী। কড়াকড়ির চূড়ান্ত শুরু হয়ে গেল। জনগণের সব আন্দোলন এইভাবে মিলিটারীর বুট দেখিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবেন বলে ভাবলেন ইয়াহিয়া খাঁ।

নিত্য নতুন শাসক নিয়োগ করে নিত্য নতুন ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টায় মেতে উঠেছিল পশ্চিমীরা। তারা মনে করল যে, এইভাবে নতুন নতুন মিলিটারী, মেসিনগান ও নতুন নতুন সব জবরদস্ত শাসক দেখে জনসাধারণ চুপ করে থাকবে।

কিন্তু এটা যে কত বড় ভুল তা অল্পদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল।

৬

'মেনে নিতে হবে জনতার রায়,
ভুলে গেছে যারা আজ,
তাদের আফ্‌শোষ হবে একদিন
জাগিলে জন-সমাজ ॥'

জাগরণ, অর্থাৎ জনজাগরণ যে কিঁ বস্তু এর আগে জানতো না পশ্চিমীরা—জানত না ইয়াহিয়া খাঁ। তাই তিনি চেয়েছিলেন আইয়ুব যা পারেনি, আমি তা নিশ্চয় পারবো। ওদের দেবো সব ঠাণ্ডা করে। আমরা সব খাঁ সাহেবের জাত—আর ওরা ভীরু বাঙালী কুত্তা। ওরা ঘেউ ঘেউ করতে পারে, কিন্তু কামড়াতে জানে না।

তাই ইয়াহিয়া খাঁর সাহস ছিল যে তিনি এই আন্দোলন ঠিক দমিয়ে দেবেন।

কিন্তু তা হলো না। ক্রমশঃ তা জোরদার হতেই লাগল। কোনও মতেই তা বন্ধ করা যায় না। তখন বাধ্য হয়ে তিনি যুক্তি পরামর্শ করতে লাগলেন তাঁর প্রিয় সহকারী বিখ্যাত পিপ্‌লস্‌ পার্টির নায়ক জুলফিকর আলী ভুট্টোর সঙ্গে।

ভুট্টোর কৌশলেই আইয়ুব গদীচ্যুত। ভুট্টোর জন্যেই আজ ইয়াহিয়া গদী পেয়েছেন। তাই ভুট্টোকে শ্রদ্ধা করে ইয়াহিয়া খাঁ।

ভুট্টো তাকে বললেন—আপনি বড়ো ভুল করছেন খাঁ সাহেব। আজকাল দিনকাল পাল্‌টে গেছে। এখন আর জোর জবরদস্তী করে কিছু হবে না। তার চেয়ে কৌশলে কাজ করতে হবে।

ইয়াহিয়া হেসে বললেন—কি ব্যাপার? কি করতে বলেন আপনি?

ভুট্টো বলেন—আজকাল লোকে গণতন্ত্র পছন্দ করে। নির্বাচন না করে সমানে মিলিটারী শাসন চালালে বিশ্বের লোকেরা বলবে কি? তার চেয়ে নির্বাচন করুন। পশ্চিমে আমার পার্টির জয় অনিবার্য। আর পূবে অন্য পার্টি আছে। ওদের মধ্যে সীট ভাগাভাগি হবে। যদি মুজিবর সামান্য কিছু সীট পায়, তাতে কোনও ভয় নেই। আমাদের সমর্থনকারী দল মুশলিম লীগ, জামাতে ইসলামও সেখানে আছে। তাছাড়া আছে বহু মোল্লা, মৌলভী, যারা ধর্মের নামে জিগীর তুলে মুজিবরকে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে তাকে ঠাণ্ডা করবে। তা ছাড়া আমরা ছাড়ব টাকা। নির্বাচনে যদি অর্ধেক সীটও ওখানে আমরা পাই তাতেও গভর্ণমেণ্ট করতে পারব। পশ্চিমী প্রতিপত্তি এখানে থাকবেই। আর আপনি থাকবেন প্রেসিডেণ্ট। ইয়াহিয়া দেখলেন যুক্তিটা মন্দ নয়।

তিনি বললেন—আর একটা কথা। যদি মুজিবর প্রচুর ভোট পেয়ে যায়—অতিরিক্ত সংখ্যায় সীট পায়?

—তাহলে নানা কৌশলে গোলমাল পাকিয়ে তুলতে অসুবিধা হবে না। তবে তা হবে না আশা করি। কারণ আমাদের দলের চাঁই ত সেখানে কম নেই।

যুক্তিটা মন্দ নয়। ইয়াহিয়া ভুট্টোর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে খুশী হলেন। তিনি বললেন—সত্যি ভুট্টো সাহেব, আপনার ব্রেনের তুলনা নেই।

ইয়াহিয়া তখন উদার ভঙ্গিতে ডাক দিলেন—নির্বাচনের ডাক। তিনি বললেন—আইয়ুব খাঁ যা বলে গেলেন তা আমি বন্ধ করতে পারি না। তিনি মেনে নিয়েছিলেন নির্বাচন—আমিও তা মানছি। নির্বাচন হবেই। যোগ্য প্রতিনিধির হাতে আমি ক্ষমতা তুলে দিতে

চাই। তবে তার জন্যে সময় লাগবে। ভোটার লিস্ট বানাতে হবে, আরও নানা কাজ আছে। অবশ্য সত্বর আমি নির্বাচন ডাকবোই।

নতুন শাসক ইয়াইয়া খাঁ বুঝতে পারলেন যে নির্বাচন ছাড়া পূর্ব পশ্চিম কোনও পাকিস্তানকেই আয়ত্বে আনা যাবে না। বরং পশ্চিমের সঙ্গে তাকে আজীবন মিলে মিশে থাকতে হবে—তা না হলে পূর্ব বাংলায় তাঁদের শাসন ও শোষণ চলবে কি করে ?

তাই তিনি বাধ্য হয়ে নির্বাচন আহ্বান করলেন। সারা পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তিনি নতুনভাবে ভোটার লিস্ট তৈরী করে ফেললেন। সকলেই খুশী হলো যে, নির্বাচন হবে এবার—হতে বাধ্য।

তারপর তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্বাচন আহ্বান করলেন। পূর্ব বাংলার জন্যে তিনি অনেকগুলি তাঁবেদার পার্টিকে তৈরী করে রাখলেন। যারা নির্বাচনে দাঁড়াবে—প্রচার চালাবে ধর্মান্ধতা ও ঐস্লামিক বিপন্নের বুলি আউরে।

ঐ বুলি বলে একদিন জিন্না সাহেব শোষণ শুরু করেছিলেন পূর্ব বাংলায়—তাই ঐ বুলিটা চালিয়ে যেতে হবেই। তা না হলে শোষণ চলবে কি করে ?

কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁ, এখনো তুমি বাঙালীকে চিনতে পারনি। ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, বাঘা যতীন আর নজরুল ইসলামের বাংলা মরে যায়নি। সালাম, বরকতের রক্তের দাগ এখনো লেগে আছে ঢাকা সহরের রাজপথে।

ইয়াহিয়া নির্বাচন আহ্বান করলেন। এ এক নতুন ধরণের নির্বাচন। পূর্ব বাংলার মানুষ কে কোন্ পক্ষে দাঁড়াল, সে উপযুক্ত কিনা তা তাকিয়ে দেখেনি। তারা জানে নৌকা মার্কাকে ভোট দেওয়া মানেই মুজিবরকে ভোট দেওয়া। তারা সেই ভাবেই ভোট দিতে শুরু করে দিল।

বহু ধর্মান্ধ পার্টি পশ্চিমের টাকা খেয়ে দাঁড়াল বিপক্ষ দলে। তাদের মধ্যে প্রধান হলো সেই সাবেকী মুসলিম লীগ আর তার সঙ্গে ধর্মান্ধ জামাতে ইসলাম পার্টি। তাদের নির্বাচন প্রোপাগাণ্ডার জন্যে পশ্চিম থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হলো।

এই নির্বাচনের প্রকৃত পরিচয় মিলবে রাজসাহী সহরের একজন মুসলমান ডাক্তারের কথা থেকে। তিনি আমাকে বললেন—আমাদের এখানে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি হলেন কামরুজ্জমান সাহেব। তাঁর নাম বিখ্যাত ছিল না। কিন্তু রাজসাহীর লোক। তাঁকে ভোট দিয়েছে শুধুমাত্র তিনি শেখ সাহেবের লোক বলে। লোকে নৌকার মার্কাকে ভোট দিয়েছে আর ভেবেছে আমরা শেখ মুজিবরকে ভোট দিচ্ছি।

এইভাবেই চলল নির্বাচন পর্ব। তার কারণ হলো শেখ সাহেবের ছয় দফা দাবী। এই ছয় দফা দাবীর প্রতি বাঙালী জনসাধারণের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। এই ছয় দফা দাবীর মধ্যে দিয়ে তিনি পশ্চিমী শাসকদের বাংলাকে লুণ্ঠন করে আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করেছেন—পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্র করার তাঁর আপত্তি নেই—কিন্তু সবার আগে বাংলার দাবী, বাংলার উন্নতি, সমৃদ্ধি ও বাঁচার অধিকার চাই।

মুজিবের ছয় দফা দাবী হলো—

১। পাকিস্তান হবে লাহোর চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত একটি ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। তার প্রতিটি প্রদেশের থাকবে নিজ নিজ স্বায়ত্বশাসন অধিকার।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে দুটি বিষয়—পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা—আর সব থাকবে প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলির হাতে।

৩। রাষ্ট্রের অর্থাৎ প্রদেশের নিজস্ব সামরিক ও রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকবে।

৪। রাজ্যগুলির জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণের অধিকার থাকবে।

৫। (ক) বিনিময়যোগ্য তুটি ভিন্ন মুদ্রার প্রচলন অথবা সারা রাজ্যের জন্য একটি মুদ্রা।

(খ) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে।

(গ) রাজ্যের কর ও ডিউটি প্রদেশ আদায় করবে। কেন্দ্রীয় সরকার তার ব্যয়ভারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবে। পূর্ব ও পশ্চিম সমানভাবে অর্থ দেবে কেন্দ্রের জন্য।

৬। (ক) রাজ্যের বা প্রদেশের নিজের হাতে থাকবে বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের ভার।

(খ) অন্তর্দেশীয় পণ্য কর ছাড়াই তুই রাজ্যের মধ্যে মালপত্র যাতায়াত চলবে।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে পাবে।

এইভাবে মুজিবর ছয় দফা যে দাবী উস্থাপিত করলেন, তাতে প্রথমতঃ বাংলাদেশের লোকের অধিকার রক্ষার সংগ্রামই জোরদার হয়নি, পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রতিটি প্রদেশের যথেষ্ট স্থবিধা হবার কথা—তাদের শক্তিশালী হবার কথা।

মুজিবর রহমান তাঁর এই ছয় দফা দাবী একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন। তাতে প্রতিটি দাবীর কারণ ও তাতে কি লাভ হবে তা বিশ্লেষণ করেন।

এই ছয় দফা দাবীর কথা ভুট্টো ইয়হিয়াও জানতেন বেশ ভাল করেই। কিন্তু তখন তাঁরা মুজিবকে কোনও বাধা দেননি। তার কারণও অবশ্য ছিল। ভুট্টো আর ইয়াহিয়া কল্পনা করতেও পারেননি যে মুজিবর রহমান এত বিপুল সংখ্যায় নির্বাচনে সাফল্যলাভ করবে।

তারা ভেবেছিল প্রত্যেকটি পার্টি কিছু কিছু সীট পাবে। তার ফলে কায়েমী স্বার্থের সমর্থক যে সব দল তাদের সঙ্গে জোট বাঁধবে, ভুট্টো নিজেই হবে তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। মুজিবরের সাফল্য নিয়ে চিন্তাও করেনি তখন।

তার কারণ প্রধান অস্ত্র ত ছিল তাদের হাতে। পশ্চিমীরা দুহাতে টাকা খরচ করেছে। প্রচুর প্রচার চালানো হয়েছে মুজিবরের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ দেশদ্রোহী—ওরা সব হিন্দু তথা ভারতের এজেণ্ট। এই সব মান্ধাতার আমলের বস্তা পচা কথা।

কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণ এখন অন্য এক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। তাদের মধ্যে এসেছে চেতনা। নিজেদের ভাল মন্দ তারা বুঝতে শিখেছে। ২৬ বছর ধরে যে বিপুল অত্যাচার করেছে বাঙালীরা তা দেখে, সহ্য করে করে তাদের মাথা খারাপ হতে বাকি আছে কিনা সন্দেহ।

আইয়ুব খাঁর আমলেই তারা দেখেছে, আইয়ুব দেশের উন্নতি করবেন বলে অত্যাচার, নিপীড়ন ও মিলিটারী মেজাজে শাসন চালিয়েছেন। আর তিনি কিন্তু ঠিকই জানেন, বাংলাদেশের টাকা কোথায় যাচ্ছে—অথচ সেদিকে তিনি নিস্তব্ধ। তা না হলে পশ্চিমীদের ভোগবিলাস চলবে কি করে? তাঁর বিলাসই বা চলবে কি করে? কিন্তু যেদিন ক্রিস্টিন কীলার ঘটিত ব্যাপারে আইয়ুবের মনের নীচতা ও নারীলোলুপতা জনসাধারণের মধ্যে যখন প্রকাশ পেলো, তখন আইয়ুব জনগণের চোখে নিজেকে যে বিরাট মূর্তিতে প্রকাশিত করেছিলেন সে ধারণা ভেঙে পড়ল। তার পরে পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্য বিরাট বিরাট আমেরিকান প্যাটন ট্যাংকে সজ্জিত হওয়াতেও যখন মার খেলো, শত শত প্যাটন ট্যাংক ও স্যাবার জেট ধ্বংস হলো, তখন লোকে বুঝল আইয়ুব দিনের পর দিন নিজেকে যে বিরাট বিখ্যাত মিলিটারী শাসক বলে প্রচার করেছে ও

নিজেদের ভারতের চেয়ে অনেক শক্তিশালী বলে ভেবেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এদিকে বাংলার বুকে আইয়ুব আনতে পারেননি কোনও উন্নতি—বরং জনগণ হয়েছে নির্যাতীত। দারিদ্র্য কিছু ঘোচেনি। শোষণ বন্ধ হয়নি। তাই লোকের চোখে মুজিবর রহমান হলো বাঙালীর সব আশা আকাঙ্খা পূরণ করবার মূর্তিমান প্রতীক। জনগণ একবাক্যে তাই সোজা গিয়ে নৌকায় ছাপ দিয়েছে।

* * * *

নির্বাচনের ফল বের হলো। এই ফল কেউ আশা করেনি। ভুট্টোও নয়, ইয়াহিয়াও নয়। ফলে তারা এই ফলাফল দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু এটা বাঙালীর কাছে মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। এই রকমই ছিল বাঙালীর প্রত্যাশা।

নির্বাচনের ফল বের হলে দেখা গেল কেন্দ্রীয় (জাতীয় পরিষদ) ও প্রাদেশিক উভয় সভাতেই শতকরা ৯৫ ভাগ আসন দখল করেছেন মুজিবর ও তাঁর দলবল। তার ফলে বাংলাদেশের মন্ত্রীত্বও আসবে তাঁর পার্টির হাতে, আবার সারা পূর্ব পশ্চিম মিলিত পাকিস্তানের তিনি হবেন প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ উজিরে আজম। মুজিবরের তখন জয়জয়াকার শুরু হয়ে গেল। সারা বাংলাদেশের মানুষ আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল মুজিবরের এই জয়লাভে।

৭

‘আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।
যবে অত্যাচারীর খড়গ-কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।’

—নজরুল

নির্বাচনে অভাবনীয় জয়লাভ করার পর শেখ মুজিবর রহমান হলেন বিরোধী দলের নেতা। আইনমত তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ইয়াহিয়া খাঁ অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকবেন।

এ আইন যে ইয়াহিয়া খাঁ জানতেন না তা নয়। মুজিবর রহমান বললেন—আমার পার্টি যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন ঢাকায় বসবে জাতীয় পরিষদের সৈঠক। প্রথমে ভুট্টো ইয়াহিয়া পিণ্ডিতে বৈঠক বসাবার কথা বলেছিলেন—কিন্তু মুজিবর তাতে রাজী হননি।

যা হোক মুজিবরের এ প্রস্তাব মেনে নিলেন ইয়াহিয়া। মুজিব বললেন, ফেব্রুয়ারী মাসে বসবে জাতীয় পরিষদ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় এসেম্বলীর বৈঠক। ১২০ দিনের মধ্যে তাঁরা সারা পাকিস্তানের জন্য আইন প্রণয়ণ করবেন।

ইয়াহিয়া এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তিনি দেরী করতে লাগলেন। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হলো যে ৩রা মার্চ বসবে জাতীয় পরিষদের বৈঠক।

অবশ্য এই ফাঁকে ইয়হিয়া খাঁ তাঁর নতুন চাল শুরু করে দিলেন। তিনি এসেছিলেন ঢাকায়। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, শেখ মুজিবর হবেন পাকিস্তানের উজীরে আজম বা প্রধানমন্ত্রী। তিনি মুজিবরের বহু প্রশংসাও করলেন ঢাকায় বসে।

আবার তিনি দৌড় দিলেন সোজা ভুট্টোর কাছে। তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল তাঁর গোপন পরামর্শ।

তিনি ভুট্টোকে বললেন—সর্বনাশ উপস্থিত। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ৩রা মার্চ বসলে মহা কেলেঙ্কারী হবে। শেখ মুজিবর হবেন প্রধানমন্ত্রী। বাঙালীর হাতে শাসন ক্ষমতা গেলে আমাদের শোষণ করা আর চলবে না।

তা শুনে ভুট্টো বললেন—ঘাবড়াও মৎ! কোনও চিন্তা নেই। আমি সব ঠিক করে দেবো।

তখন ভুট্টো ঘোষণা করলেন তাঁর নতুন বক্তব্য। তিনি বললেন —পূবের জন্যে মুজিব মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন বটে, তবে তিনি নিজে হলেন পশ্চিমের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তাই তাঁকে পশ্চিমের শাসন ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে। তা ছাড়া জাতীয় পরিষদেও দুই প্রধান দল পৃথক পৃথক ভাবে শাসন করবে। মুজিবের অধীনে তিনি কাজ করবেন না।

ইয়াহিয়া সে কথা জানালেন মুজিবকে। মুজিব উত্তরে বললেন— জাতীয় পরিষদের সভা আগে বসুক, তারপর সব স্থির করা যাবে।

ভুট্টো বললেন—তাঁর দাবী না মানলে তিনি বসবেন না জাতীয় পরিষদে।

ইয়াহিয়া তখন হেসে বললেন—আমি ত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজী, কিন্তু দুই প্রধানের মধ্যে যদি মিটমাট না হয়, তা হলে কি করে হস্তান্তর করতে পারি?

এদিকে ইয়াহিয়া খাঁ ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক ঢাকাতে আহ্বান করার ফলে পশ্চিমের অন্যান্য সব প্রদেশের নেতারা এলেন ঢাকাতে। এলেন সীমান্তের নেতা খান ওয়ালী খান, আবদুল কোয়ায়ুম খান প্রভৃতি সকলে। তা ছাড়া ভুট্টোর পিপল্‌স্ পার্টির অনেক নেতাও এসে গেলেন ঢাকায়।

ভুট্টো তাদের জানিয়ে দিলেন, তারা যেন জাতীয় পরিষদে যোগ না দেয়। আগে চাই মীমাংসা।

ইয়াহিয়া খাঁ তখন পিণ্ডি থেকে হঠাৎ ঘোষণা করলেন—না, ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে না। তার কারণ হলো প্রথমতঃ ভুট্টোর এতে যোগ দিতে আপত্তি আর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের মন কষাকষি।

অবশ্য এ মন কষাকষির ঘটনাও সৃষ্টি করলেন ভুট্টো সাহেব কৌশলে। একজন বিমান দস্যুকে দিয়ে তাঁরা ভারতের একটি বিমান চুরি করে নিয়ে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ভারত জানাল, তাদের বিমান ফেরৎ দিতে হবে—তা না হলে ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে।

ভুট্টো ইয়াহিয়া এইবার ঘোষণা করলেন আচমকা যে, ৩রা মার্চ অধিবেশন বসবে না। মুজিবর হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতা—অথচ তাঁর সঙ্গে কোনিও কথাবার্তা না বলেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন ইয়াহিয়া খাঁ।

এ কথা শুনে মুজিবর বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলেন। রাগে ফেটে পড়ল পূর্ব বাংলার মানুষ। এ কি অন্যায়! এ সব ক্ষমতা হস্তান্তর না করার হীন চক্রান্ত।

তার উত্তরে ইয়াহিয়া জানালেন, তিনি অধিবেশন বন্ধ রাখতে বদ্ধ পরিকর অনির্দিষ্টকালের জন্য তা বন্ধ থাকবে।

তখন মুজিবর পূর্ব বাংলায় হরতালের ডাক দিলেন। ডাকা হলো

হরতাল। সারা ঢাকা সহর স্তব্ধ হলো। খুলল না দোকানপাট, গাড়ি চলল না। সারা সহর থম্‌থমে আকার ধারণ করল।

এদিকে পূর্ব বাংলার বহু অবাঙালী হরতালে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত করে। ক্রুদ্ধ বাঙালীরা তাদের দোকানপাট লুট করল, তাদের সিনেমা গৃহ পুড়িয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খাঁর অনুচর চালালো বাঙালী মুসলমানদের উপরে মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ। শোভাযাত্রার উপরে গুলি চলল। পূর্ব পাকিস্তানে একদিনে কয়েক হাজার লোক নিহত হলো। কেউ বলে তা মোট তিন হাজার, কেউ বলে আরও অনেক বেশি।

তিনদিন ধরে মিলিটারীরা এই ভয়ংকর অত্যাচার ও নরহত্যা চালিয়ে তারা ফিরে গেল ব্যারাকে। তারা তাদের কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিতে গেল।

জনতা আরও উত্তাল হয়ে উঠল। এই অত্যাচার পশ্চিমীরা চালিয়েছে এতদিন ধরে। আর তারা কোনও অত্যাচার মানবে না—মানতে রাজী নয়। ভুট্টো আর ইয়াহিয়ার মুখোশ খুলে গেছে। আর তাদের প্রতি কোনও আস্থা বাঙালী জনগণের নেই।

* * * *

‘এত বিপ্লব কভু দেখে নাই কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।’

—সুকান্ত

বাঙালী আজ জেগে উঠেছে। জেগে উঠেছে পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, বুড়িগঙ্গা, আর ইছামতী তীরের প্রতিটি মানুষ।

হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্যে তারা কাঁদবে না—তারা শোক প্রকাশ করবে না। তারা আজ এক নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত।

শহীদ মিনারে জড়ো হতে লাগল মানুষ। তাদের চোখে জল নেই—আছে দৃঢ়তা, আছে ঐক্যবদ্ধ এক সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা।

ঢাকার ইউনিভার্সিটি হলে ডাকা হলো বিরাট এক মিটিং। এই মিটিংএ হাজার হাজার লোক—যুবক, ছাত্র, অধ্যাপক, কেরাণী, বুদ্ধিজীবি থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই যোগ দিল।

মুজিবর ঘোষণা করলেন—আপনারা উত্তেজিত হবেন না—আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তভাবে সংগ্রাম করুন। অসহযোগ করুন মিলিটারীদের সঙ্গে। সব অফিস কাছারী অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। পূব থেকে কোনও টাকা যাবে না পশ্চিমে। অবশ্য দেশের মধ্যে চিঠি পত্র, মনি অর্ডার চলতে থাকবে। ব্যাংকগুলি মাত্র তিন ঘণ্টার জন্যে খোলা হবে।

যত সব কোর্ট কাছারি অফিস আদালত বন্ধ থাকল। কেউ কোর্টে যায় না—সরকারী অফিসে যোগ দেয় না। এমন কি বিমান-বহর ও জাহাজের ডকের বাইরেও জনগণ অসহযোগ সুরু করল। কেউ মাল খালাস করে না। সর্বত্র চাঞ্চল্য।

৬ই মার্চ আবার বিরাট এক সভা আহ্বান করলেন শেখ মুজিবর ঢাকার রমনার রেসকোর্সে।

* * * *

উত্তাল হয়ে উঠেছিল জনসমুদ্র। ঢাকার রমনার মাঠে সেদিন বসল এক ঐতিহাসিক সভা। লক্ষ লক্ষ লোক তাতে যোগ দিল মিলিটারীর ভয় তুচ্ছ করে।

মাথার উপরে পত্ পত্ করে উড়ছিল বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। সবুজের উপরে লাল বৃত্ত—আর মাঝে সোনালী রঙে পূর্ব বাংলার মানচিত্র। সেই অপূর্ব পতাকাকে সকলে অভিবাদন জানাল। সকলের কণ্ঠে উঠল চীৎকার—জয় বাংলা।

প্রতিটি বাঙালীর কণ্ঠে আজ এক শ্লোগান। তা হলো জয় বাংলা। প্রত্যেকের কণ্ঠে এক সংগীত—তা হলো কবিগুরু রচিত জাতীয় সংগীত—

'ওগো আমার সোনার বাঙলা
তোমায় আমি ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥'

জনগণের মধ্যে আজ নতুন এক জাগরণ—নতুন উত্তেজনার জোয়ার। পশ্চিমী মিলিটারীরা অত্যাচার করে, গুলি চালিয়ে, তিন হাজার লোককে খুন করেও তা দমাতে পারেনি—বরং তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে—আর উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

এই ঐতিহাসিক সভায় শেখ মুজিবর যখন ডায়াসে উঠে দাঁড়ালেন, তখন লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—জয় শেখ মুজিবর রহমান! জয় বাংলা, সোনার বাংলা!

শেখ মুজিবর তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন।

ভাইরা আমার,

আপনারা জেনে রাখুন আমি প্রধান মন্ত্রীত্বের পদের জন্য লালায়িত নই। সহস্র শহীদের রক্তের উপরে পা দিয়ে আমি এসেম্বলীতে যেতে চাই না। আমি চাই আমার ভায়েদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে যে অন্যায় জুলুম ও নরহত্যা হয়েছে, তা চিরতরে বন্ধ করতে হবে—আমাদের দাবী মানতে হবে।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলেছিলাম, আপনি আসুন, দেখে যান বাঙালীর উপরে কি ভয়াবহ অত্যাচার হয়েছে, কিন্তু তিনি এলেন না। আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম যে এখনো বাংলার মাটি থেকে রক্তের দাগ শুকায়নি। সে অবস্থায় আমি তাঁর কথামত এসেম্বলীতে যোগদান করার কথা কল্পনা করতেও পারি না। প্রধান মন্ত্রীত্বের গদীর লোভ আমার নেই। আগে আমাদের দাবী তাঁকে মানতে হবে। আমার দাবী হলো:

১। সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। তারা কখনো

আমাদের ওপর, আমার ভাইদের ওপর কোনও অত্যাচার করতে পারবে না।

২। সৈন্যদের এই অত্যাচারের জন্য উপযুক্ত তদন্ত করতে হবে।

৩। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৪। সৈন্যরা ভবিষ্যতে কখনো অত্যাচার করবে না সে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

ভাইরা আমার, আমি জীবনে কখনো বেইমানি করি নাই, কখনো তা করবো না। আমার উপরে আপনাদের বিশ্বাস আছে?

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ জনতা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল—আছে, আছে, আছে।

মুজিবর বলে চললেন—তা হলে আজ থেকে পূর্ব বাংলার বুকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে সব কোর্ট, কাছাড়ি, সরকারী ও আধা সরকারী অফিস বন্ধ থাকবে। কোনও বাঙালী এসব অফিসে যোগ দেবে না।

আমরা ওদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে অসহযোগিতা করে চলব। আমার ভাইরা যাতে কষ্ট না পায়, তার জন্যে ব্যাঙ্কগুলি তিন ঘণ্টা করে খোলা থাকবে। দেশের মধ্যে ডাক চলাচল ও মনি অর্ডার চলবে - কিন্তু পশ্চিমে একটা টাকাও যাবে না। সব টাকা আমাদের জাতীয় ব্যাঙ্কে জমা থাকবে। স্কুল, কলেজ, মিল ফ্যাক্টারী সব বন্ধ থাকবে। শ্রমিকরা যাতে কষ্ট না পান, তার জন্যে মালিকরা আপনাদের এক মাসের অগ্রিম মাইনে দিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন।

আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমরা ওদের সঙ্গে মোটেই সহযোগিতা করব না। আমরা ওদের ভাতে মারব—আমরা ওদের পানিতে মারব। আর যদি ওরা আমাদের উপরে ভবিষ্যতে আরও অত্যাচার চালাতে না পারে তার জন্যে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে

তুলুন। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো উত্তেজনা বা মারামারি নয়—আমরা শান্তভাবে ওদের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগ করতে চাই।

* * *

পল্টন ময়দানে শেখ মুজিবরের এই ঘোষণা এক ঐতিহাসিক ঘোষণা। শুধু এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশে শুরু হলো অসহযোগিতা, শুরু হয়ে গেল হরতাল। পূর্ণভাবে জনসাধারণ সামরিক বাহিনী ও তাদের লোকদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে চলল। এমন কি ডকে বা বিমান বন্দরে মাল খালাস হয় না। সর্বত্র চলল নতুন এক উত্তেজনার প্রবাহ—নতুন যুগের সাড়া।

এদিকে ইয়াহিয়াও চুপ করে বসেছিলেন না। তিনি এই নবজাগরণ বন্ধ করে কড়াভাবে শাসন করার জন্যে পূর্ব বাংলার শাসক করে পাঠালেন কড়া জবরদস্ত মিলিটারী শাসক টিক্কা খাঁকে।

টিক্কা খাঁ এলেন ঢাকায়। তিনি প্রধান বিচারপতিকে বললেন, তাঁকে শপথ পাঠ করাবার জন্যে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি জবাব দিলেন—শপথভঙ্গকারীদের তিনি শপথ পাঠ করাতে পারেন না। আইনতঃ পূর্ব বাংলার শাসনভার পাবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি শেখ মুজিবর। টিক্কা খাঁকে তাঁরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন।

শুধু প্রধান বিচারপতি নন, কোনও বিচারপতিই শপথ পাঠ করাতে রাজী হলেন না।

এদিকে ঢাকায় শেখ মুজিবরের বাড়ী তখন একটি সরকারী কার্যালয়ে পরিণত হয়ে উঠেছে। দলে দলে লোক সেখানে আসছে। নির্দেশে কাজ করছে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকগণ। বড় বড় সব অফিসার, আই জি, ডি আই জি, ম্যাজিস্ট্রেট সব তাঁর কথা মত কাজ করে চলেছে। সে যেন এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব থেকে একটি টাকাও যাবে না পশ্চিম পাকিস্তানে।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। কিন্তু তিনি একবার

বিমানে ঢাকার উপর দিয়ে ঘুরে গেলেও ঢাকা বিমান বন্দরে প্রচুর লোকের সমাবেশ দেখে নামতে সাহস পেলেন না। তিনি করাচী থেকে ঘোষণা করলেন ২৫শে মার্চ ঢাকায় বসবে জাতীয় পরিষদের বৈঠক। ঐ বৈঠকে সব আলোচনা হবে।

তার উত্তরে মুজিবর জানালেন, তাঁর ছয়টি দাবী মেনে না নিলে জাতীয় পরিষদে তিনি যেতে পারেন না। তিনি জন-প্রতিনিধি—জনগণের সঙ্গে বেইমানি করতে পারেন না।

ইয়াহিয়া বুঝলেন বাঙালী জাতির মধ্যে আজ এসেছে ঐক্য। তাদের চট্ করে দমানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঢাকা বা পূর্ববঙ্গে এত মিলিটারী নেই যে তিনি জোর করে কোটি কোটি লোকের এই অন্দোলনকে বন্ধ করতে পারেন।

তাই তিনি মুজিবকে জানালেন—আমি একবার যাব ঢাকায় আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে। সেইখানেই সব কথা পাকাপাকি স্থির হবে। আসলে ইয়াহিয়া চান সময় কাটাতে। এই ফাঁকে তিনি হাজার হাজার সৈন্যকে জাহাজ ভর্তি করে পাঠালেন বাংলাদেশের দিকে। তারা না পৌঁছানো পর্যন্ত কিছুই করতে পারেন না ইয়াহিয়া।

মুজিবর সরল মানুষ। তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না ইয়াহিয়ার এই প্যাঁচ। তিনি জানালেন যে তিনি আলোচনা করতে রাজী আছেন। ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব বাংলার অতিথি বা মেহ্মান। তাঁকে সসম্মানে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ইয়াহিয়া খাঁ মনে মনে রাগলেন। তিনি হলেন সারা পাকিস্তানের সর্বেসর্বা বা প্রেসিডেন্ট, তিনি হলেন পূর্ব বাংলার মেহ্মান! একথা বলাও অন্যায়। একথা বলা মানে মুজিবর নিজেকে বাংলা দেশের সর্বেসর্বা বলে মনে করছেন।

তবু মনের রাগ মনে চেপে রাখলেন ইয়াহিয়া খাঁ। এখন তিনি

পড়েছেন কঠিন এক প্যাঁচে—তাই সব কথা তাঁকে মেনে নিতেই হবে। এ ছাড়া ইয়াহিয়ার অন্য কিছু করার পথ তখন খোলা ছিল না। অবশ্য সবই তিনি করেছিলেন তাঁর সঙ্গী ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে। ভুট্টো সাহেব না হলে এত প্যাঁচ তাঁর মাথায় জোগাবে কে ?

এই প্যাঁচ মত ইয়াহিয়া বিমানে চেপে গিয়ে নামলেন ঢাকায়। প্রেসিডেন্ট ভবনে তিনি উঠলেন—মুজিবকে আহ্বান জানালেন আলোচনার জন্যে।

৮

'বীরের এ রক্তস্রোত,
মাতার এ অশ্রুধারা,
সবই ধরার ধূলিতে হবে কি হারা ?'

দিনের পর দিন আলোচনা চলল। ইয়াহিয়ার সুর এখন খুবই নরম। তিনি মুজিবকে বললেন—আপনিই ত হতে চলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, তবে কেন আগে থেকে এই সব দাবী নিয়ে সময় ক্ষেপ করছেন।

মুজিব বললেন—আপনার কথা আপনি কখনো ঠিক রাখেননি—তাই এখনো ঠিক থাকবে বলে ভরসা করি না। আপনি বলেছেন জাতীয় পরিষদ বসবে ২৫শে মার্চ। কিন্তু ভুট্টো সাহেব তা দেবেন গড়বড় করে।

ইয়াহিয়া বললেন—মিলিটারী প্রত্যাহার করা থেকে যা যা দাবী করেছেন, সে সবই মানা হবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শেষ হলেই। তাই আগে তা নিয়ে হৈ চৈ করে লাভ কি ? তা ছাড়া তদন্ত কমিটি বসাতে বলেন—তাও আমি একটা বসাতে পারি।

মুজিব বললেন—তা হবে না। বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই—কয়েকজন বিচাপতি তদন্ত করবেন—আপনার মনোনীত লোক নয়।

এইভাবে কথাবার্তা চলল। প্রথম দিন মুজিব একা যান। কিন্তু তিনি সাক্ষী রাখার জন্যে তাঁর দলের আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে যান। ইয়াহিয়া খানও সঙ্গে কয়েকজন লোক রাখেন। দুপক্ষে কথাবার্তা চলতেই থাকে। দিন কাটে, কিন্তু মীমাংসা হয় না।

ইয়াহিয়া শেষে বললেন—আমি ত সব বিষয়ে কথা দিতে পারি না আপনাকে। আমি ত থাকবো নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট। আপনাদের দিয়েই কাজ চলবে। তাই আমাদের বিরোধী নেতা ভুট্টোর সঙ্গে আলেচনা করা উচিত।

আসলে ইয়াহিয়া হালে পানি না পেয়ে তাঁর পরামর্শদাতা ভুট্টোকে ডেকে আনতে চাইলেন।

মুজিবর তাতে আপত্তি জানালেন না। তিনি বললেন—ঠিক আছে, ভুট্টো সাহেব আসুক। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে করাচীতে খবর পাঠানো হলো। এলেন সেখান থেকে ভুট্টো সাহেব। ভুট্টো সাহেব করাচী থেকে ঢাকাতে পা দিয়েই চমকে উঠলেন। যে হোটেলে তিনি থাকতেন তার চার পাশ ছাত্ররা ঘেরাও করল। তারা উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল—ভুট্টোকে নিয়ে নাস্তা করব। তাদের উত্তেজনা যে কতটা তা এতেই বোঝা যায়।

ভুট্টো বুঝলেন কি পরিমাণ আগুন জমা হয়েছে পূর্ব বাংলার বুকে। তিনি বুঝলেন পূর্ববাংলা আজ অগ্নিগর্ভ। তা ছাড়া দেখলেন, প্রতিটি ভবনের মাথায় উড়ছে কালো পতাকা আর বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। পাকিস্তানী পতাকা কোথাও উড়ছে না।

ভুট্টো তাই মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না।

মিষ্টি কথায় ভুট্টোর সঙ্গে কেউ পারবে না। তিনি বুঝতে পারলেন, কেন তাঁর আসা, কেন এই সব দিনের পর দিন আলোচনার প্রহসন! আসলে এ সবই হলো একটা ভাঁওতা মাত্র। আসলে দিন কাটানো বা কালক্ষেপণ মাত্র। যতদিন না করাচী থেকে পাঠানো সৈন্যভরা জাহাজগুলি এখানে এসে না থামে।

আলোচনা চলল। ভুট্টো বললেন—আপনার মাধ্যমে সব ঠিক

য় যাবে—কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু আলোচনায় কোনও কাজই হলো না। শুধু দিন কাটতে কাটতে অবশেষে পাক সৈন্যরা এসে পৌঁছে গেল।

আর কথা বলে লাভ কি? ভুট্টো ইয়াহিয়া দেখলো, আর কথা বলে কালক্ষেপণ করে কোনও লাভ নেই। এবার কাজে নামতে হবে।

তাই ২৪শে মার্চ গভীর রাতে ভুট্টো আর ইয়াহিয়া গোপনে পূর্ববাংলা থেকে পিণ্ডি চলে গেলেন রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে। আর পূর্ববাংলাকে তুলে দিয়ে গেলেন টিক্কা খাঁ আর তার মিলিটারীদের হাতে।

* * *

শুরু হলো এক নৃশংস অত্যাচারের অধ্যায়। গভীর রাতে হানা দেওয়া হলো মুজিবের বাড়ি। মিলিটারীরা প্লেন ড্রেসে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিতে দিতে গিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে চলে গেল। অবশ্য অন্য সব আওয়ামী লীগের নেতারা সুযোগমত আগেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন।

অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন জাগে—তা হলো কেন মুজিব সময় মত গা-ঢাকা দেননি? তিনি ত আগেই সব বুঝতে পেরেছিলেন। তবে তিনি ধরা দিলেন কেন?

এর উত্তরে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন—তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি গা-ঢাকা দিলে প্রচণ্ড অত্যাচারে হবে জনগণের উপর। কিন্তু তিনি ধরা দিলে তা হবে না। তাই তিনি স্বেচ্ছায় ধরা দেন ইয়াহিয়া খাঁর প্রেরিত লোকদের হাতে।

কিন্তু মুজিবের এ ধারণা ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। পরদিন থেকেই শুরু হলো অকথ্য নির্যাতন আর অত্যাচার। যেন বিরাট অত্যাচারের ঢেউ চলল সারা বাংলাদেশে। যেখানে বাঙালীকে দেখেছে—গুলি

করে মেরেছে পাক সেনারা। উড়িয়ে দিয়েছে কামান দেগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দলে দলে বুদ্ধিজীবী—উকিল, প্রফেসার, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতিকে ধরে ধরে পথের উপরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। এ অত্যাচারের এ হত্যার যেন তুলনা নেই।

এদিকে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করল। তারা রেডিওতে বললে—আজ থেকে বাংলা দেশ স্বাধীন। বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়া তার সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের ওপর। আমাদের হাজার হাজার নিপরাধ নিরস্ত্র লোককে তারা গুলি করে মারছে।

আপনারা পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। মিলিটারী দেখলেই তাদের ওপরে সোডার বোতল, ইট, হাতবোমা প্রভৃতি নিক্ষেপ করুন, মরিচের গুড়া নিক্ষেপ করুন। প্রাণ যদি দিতেই হয় তবে তার আগে লড়াই করে প্রাণ দেবেন।

সত্যি জেগে উঠল জনতা। কিন্তু তাদের সাধ্য সীমিত। তারা হাজার হাজার লোক মিলিটারীদের আক্রমণ করে লাঠি, বল্লম, তীর ধনুক প্রভৃতি নিয়ে। কিন্তু তাতে কি ফল হবে? ইয়াহিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর হাতে তারা দলে দলে প্রাণ দিতে থাকে।

কিন্তু অন্যদিকে জেগে উঠল মুক্তিফৌজ বাহিনী। বাঙালী আর্ম পুলিশ, ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্, মুজাহিদ বাহিনী প্রভৃতি সকলে একত্র হয়ে সৈন্যদের সঙ্গে প্রকাশ্য লড়াইয়ে নেমে পড়ে। মুক্তিফৌজ যে নিহত না হয় তা নয়, তবে তারা লড়াই না করে প্রাণ দেয় না—তাই সৈন্যরা তাদের ভয় করে চলে।

সৈন্যরা তাই আতংক সৃষ্টির জন্যে হাজারে হাজারে মানুষকে গুলি করে মারে। যুবতী নারীদের ধরে নিয়ে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করে। ঢাকার এক ছাত্রী হোস্টেল থেকে একদিনে তারা কয়েক শো যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়। তারা যে কে কোথায় তা কেউ জানে না—তারা

বাংলায় আছে না তাদের পাচার করা হয়েছে বিদেশে তাই বা কে জানে ?

এইভাবে চলে অত্যাচার।

একদিনেই ঢাকা সহরের বুকে যে পরিমাণ মানুষ প্রাণ দেয় তার হিসাব করা সম্ভব নয়। কেউ বলে পঞ্চাশ হাজার, কেউ বলে আরও বেশি।

শুধু ঢাকা নয়, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর, রাজসাহী, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, বরিশাল—সারা পূর্ব বাংলায় চলল এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড।

মুক্তিযোদ্ধারা সামনা-সামনি লড়াই করে। তবে তারা যখন যেখানে হেরে যায়, সেখানে সৈন্যরা প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, নারীদের অপহরণ করে নিয়ে যায়।

মোট হিসাবে জানা যায় এ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বুকে মোট প্রায় আট দশ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে, নারী অপহৃত হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কি আরও বেশি।

‘শবে শবে আকীর্ণ হলো,
পদ্মা, মেঘনা, ইছামতীর কূল।
লক্ষ কোটি বাঙালীকে স্তব্ধ করার
নব ইতিহাস রচেছে নির্ভুল।
মানুষের ইতিহাসে কভু কেউ
দেখে নাই এত অত্যাচার।
হিংসার চূড়ান্ত রূপ হতে পারে কি যে ভয়াবহ
আছে কত কালো অন্ধকার।’

ধ্বংস, ধ্বংস আর ধ্বংস। হত্যা হত্যা আর হত্যা। এ যেন গণ হত্যা নয়—এ হলো বীভৎস অগনন হত্যা। এ হত্যার শেষ কোথায় তা কেউ জানে না —আজও তা কেউ কল্পনা করতেও পারে না।

ধ্বংস আর হত্যার নব ইতিহাস যেন লেখা হলো পূর্ব বাংলার বুকে। স্তব্ধ হলো হিটলার। স্তব্ধ হলো পৃথিবীর পূর্বেকার সব যুদ্ধের ইতিহাস। এত নিরস্ত্র মানুষকে যে কেউ হত্যা করতে পারে, তা এর আগে বিশ্বে কেউ কখনো কল্পনা করতেও পারেনি।

শুধু সহর নয়—সুযোগ মত গ্রামে গ্রামে চলল অত্যাচার, চলল খুন. লুট, ধর্ষণ। আর মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণ তুচ্ছ করেও সুরু করে দিল মুখোমুখি যুদ্ধ।

যে গ্রামে তারা যখন ঢুকছে, সেই গ্রামকেই হিংস্র নখর দন্তাঘাতে তারা দীর্ণ বিদীর্ণ করেছে।

মুক্তিফৌজদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমটা সেনারা সুবিধা করতে অবশ্য পারেনি। কারণ মুক্তিফৌজের ছিল জন সমর্থন—যা পাক সেনার ছিল না।

কিন্তু তারা তখন সুযোগ বুঝে মুক্তিফৌজের উপরে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ শুরু করল, হাজারে হাজারে বোমা বর্ষিত হতে লাগল মুক্তিসেনাদের ওপর, নিজের দেশের জনগণকে হত্যা করার এই ইতিহাস পৃথিবীর বুকে আর কখনো কেউ শোনেনি ইতিপূর্বে।

ট্যাংক, কামান ব্যবহৃত হয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা গুলি চলেছে। মানুষের মৃতদেহে আকীর্ণ হয়ে আছে চারিদিক। কখনো মুক্তি ফৌজ এগিয়ে যায়, কখনো তারা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। কারণ তাদের নেই ট্যাংক, কামান, নেই গাড়ি। তবু তারা সুযোগমত সৈন্যদের মেরে তাদের অস্ত্র দখল করে নেয়। তাই নিয়েই তারা লড়াই চালায় তাদের বিরুদ্ধে।

চীনের দেওয়া কত মেসিন গান, আমেরিকার দেওয়া মেসিনগান মুক্তি যোদ্ধারা ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই দিয়ে তারা আবার যুদ্ধ করেছে। তবু যতটা সম্ভব তারা বীরত্ব প্রকাশ করেছে।

এমন কি তারা ঐ সামান্য অস্ত্র সম্বল নিয়ে কতো প্লেন পর্যন্ত ধ্বংস

করেছে। তাল গাছের উপরে ঘাপটি মেরে বসে থাকে মেসিনগান হাতে নিয়ে। প্লেন দেখতে পেলেই, প্লেন নিচে বোমা ফেলতে নামলেই মেসিনগান চালিয়ে প্লেন ধ্বংস করে। কখনো বা শত্রুদের কামান দখল করে নেয়। কামানের গোলা মেরে মেসিনগান ধ্বংস করে।

আরও নানা অভিনব কৌশলে যুদ্ধ করেছে পাক বাহিনী দিনের পর দিন।

সুযোগ পেলেই তারা বড় বড় পথের উপরে খাল কেটে তার উপরে কালো কাপড় বিছিয়ে রেখেছে। যেই ট্যাংক বা বড় মিলিটারী লরী আসে, তা খাদে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে চারধার থেকে শুরু হয়ে যায় গুলি গোলা বর্ষণ। সৈন্যরা প্রাণ দেয়। যারা পালায় তারা গ্রামের মধ্যে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ দেয়।

এইভাবে নানা কৌশলে যুদ্ধ করেছে বলে যুদ্ধটা যত সহজে মিটবে বলে মনে করেছিল ইয়াহিয়া তা আসলে হয়নি।

ইয়াহিয়া খাঁ ভেবেছিল দু দশদিন ভয়াবহ ভয় বা আতংক সৃষ্টি করলেই জনগণ প্রাণভয়ে আত্মসমর্পণ করবে। তিনি আবার চালাবেন মিলিটারী শাসন।

কিন্তু জনসাধারণ ও মুক্তিফৌজ যে এত বাধা দেবে, এভাবে লড়াই চালাবে তা ভাবতে পারেনি ইয়াহিয়া।

ইয়াহিয়া তাই পড়লেন মহা বিপাকে। তার হাজার হাজার সৈন্য মারা গেল, কতো যে আহত হলো তার ঠিক নেই—তবু যুদ্ধ থামে না।

যতো সৈন্য মরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তত সৈন্য আনান আবার ইয়াহিয়া। কিন্তু মরতে মরতে তাদের এমন অবস্থা হলো যে আর বেশি সৈন্য আসতে চায় না।

তা ছাড়া শুরু হলো খাদ্যাভাব। খাদ্যের অভাবে সৈন্যরা হয়

বিরক্ত। যা সামান্য খাদ্য পায়, তা খেয়ে কোনও ভাবে দিন কাটায়।

তাই বহু পাক সেনা বাংলাদেশ থেকে এসে ভারতে ঢুকে পড়ে ভারতীয় মিলিটারীর হাতে আত্ম সমর্পণ পর্যন্ত করেছে। তাদের সংখ্যাও অনেক। বেশির ভাগই পলাতক সৈন্য জন সাধারণের হাতে মারা গেছে।

এইভাবেই যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২৫শে মার্চ—যে অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু হয়েছিল—তা আজও শেষ হয়নি। তা চলছে।

* * *

এই বিরাট যুদ্ধের খতিয়ান সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভব নয়। দিনের পর দিন তা চলেছে। দিনের পর দিন ধরে বহু শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে ভারতে—বিশেষ করে ভারতের—আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে। বিহারেও গেছে কিছু শরণার্থী।

প্রথমে যখন সহরে সহরে যুদ্ধ চলেছে, তখন পাক সেনারা গ্রামে ঢুকতে সাহস পায়নি—তখন বেশি শরণার্থী আসেনি এখানে। সহরের লোকরা পালিয়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধ চলতে থাকলে গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রবেশ করেছে পাক সৈন্য। তখন বাধ্য হয়ে শরণার্থীরা প্রাণের ভয়ে পায়ে হাঁটা পথে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে আশ্রয় নিয়েছে ভারতের বুকে। বিভিন্ন প্রদেশে তারা প্রবেশ করেছে সুযোগ ও সুবিধা মত।

এই সেই শরণার্থীর সংখ্যা যে কতো হবে তা এখন বলা যায় না। এই কয় মাসের যুদ্ধে মোট ৮০ লক্ষ শরণার্থী ভারতে এসেছে—আরও আসবে—আরও আসছে। অনেকের মতে শরণার্থীর সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

এর ফলে ভারতের বুকেও সৃষ্টি হয়েছে বিরাট এক সমস্যা। এই এক

কোটি শরণার্থীর বিরাট বোঝা কে বহন করবে বা করতে পারে? হিসাব করে দেখা গেছে এই সব শরণার্থীকে ছয় মাস রাখতে হলে খরচ হবে প্রায় তিনশো কোটি টাকা। ভারত সরকার এ নিয়ে সারা বিশ্বের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। সাহায্য যে আসছে না, তা নয়। তবে এই বিরাট সংখ্যক শরণার্থীর তুলনায় কতটুকু সাহায্য আসছে? তা অতি নগণ্য বলা চলে।

তাই এই যুদ্ধে ভারতেরও কম ক্ষতি হয়নি। ভারতের নিজের সমস্যা নিয়েই ভারত বিব্রত—তার মধ্যে এই বিরাট সমস্যা তার পক্ষে সামলানো খুবই কঠিন। এ বিষয়ে ভারত বিশ্বের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে।

কিন্তু আশ্চর্য রাষ্ট্রসংঘে ও সারা বিশ্বে আবেদন জানিয়েও কোন ফল হয়নি—হবে কিনা তাও কেউ জানে না।

সারা পৃথিবীর নানা দেশ ইয়াহিয়া খাঁর নামে মুখে নিন্দা প্রচার করতেও প্রত্যক্ষভাবে রাজী হচ্ছে না কেউ।

প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারত এর প্রতিবাদ করে। এই বিরাট গণহত্যা ও গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরা অন্যায় বলেছিল তারা। তার উত্তরে পাকিস্তান জানাল এটা তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। এ বিষয়ে কারও কিছু বলার নেই। বললে তা হবে অন্যায়।

ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি বহু দেশ এর বিরুদ্ধে বলেছে—কিন্তু সবাইকেই এক জবাব দেওয়া হয়েছে—ইয়াহিয়ার এক কথা—এটা হলো আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। কিছু বলার নেই আপনাদের।

রাষ্ট্রসংঘ কিছুই করেনি। রাষ্ট্রসংঘ যেন ঠিক নির্বাক দর্শক মাত্র। বিশ্বব্যাংক অবশ্য পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করেছে।

এদিকে নানা দেশ থেকে দলে দলে প্রতিনিধিরা এসেছে ভারত পরিদর্শনে। শরণার্থীদের তাঁরা দেখেছেন—দেখে শুনে বিস্মিত ও

বিহ্বল হয়েছেন। সত্যি কোনও সরকার যে তার জনগণের উপর এমন অত্যাচার করতে পারে তা তাঁরা ভাবতেও পারেন না। তাঁরা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে ফিরে গেছেন মাত্র।

বৃটিশ এম পি.ডগ্‌লাসম্যান্ বলেছেন—ভিয়েৎনামে 'সাইলাণ্ট' একটা ব্যতিক্রম—কিন্তু সারা পূর্ববাংলাই আজ সাইলাণ্টে পর্যবসিত হয়েছে।

তারপর এসেছিলেন ক্যানাডার প্রতিনিধি। তিনি একবাক্যে নিন্দা করেছেন। এসেছিলেন এম্ বটয়নি ও তাঁর সঙ্গীরা। তাঁরা বলেছেন ইয়াহিয়ার অত্যাচার বর্বরোচিত। বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হওয়া অবধি বৃটেনও কোনও সাহায্য দেবে না বলেছে পাকিস্তানকে।

কিন্তু এর বিপরীত চিন্তাও আছে। আমেরিকা প্রকাশ্যে পাকিস্তানের সাহায্য বন্ধ করবে স্বীকার করেও তিন জাহাজ অস্ত্র পাঠিয়েছে পাকিস্তানে। আরব রাষ্ট্ররা আজও নীরব। ইয়াহিয়া তাদের সব বুঝিয়েছে, পূর্ব বাংলার হিন্দু মুসলমান সবই সমান—অর্থাৎ কাফের। তাদের ধ্বংস করা উচিত। তা না হলে পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব থাকবে না—থাকবে না ঐস্লামিক রাষ্ট্র সমূহের একতা। তাই তাঁরা চুপ করে আছেন।

অবশ্য আরব শত্রু ইস্রায়েল তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন ইয়াহিয়া খাঁর কার্যকলাপের।

এইভাবে নানা মতবাদ ও নানা আদর্শে বিশ্বে যে আজ হৈ চৈ চলেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজের মত কাজ কিছুই হয়নি।

বিশ্ববিবেক যেন ঘুমন্ত জাগ্রত। প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত—তাই এই বিরাট ব্যাপারে মাথা ঘামাবে কে?

এইভাবেই যুদ্ধ চলছে। মুক্তিযোদ্ধারা কিন্তু এখনও সংকল্পে অটল। তারা এ যুদ্ধে জয়লাভ করবেই—তারা পরাজয় বরণ করতে শেখেনি।

৯

সেদিন বাংলার ভাগ্যে একটি স্মরণীয় দিন। যেদিন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো।

মুজিবনগরের একটি আম্রকুঞ্জে এই দিন স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হলো।

মাথার উপরে উড়ছিল বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা। তার নীচে বসে শত শত লোকজন ও সাংবাদিকদের সামনে স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হলো।

বাংলাদেশের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। এই দেশে যদি কোনও সরকার গঠিত হয় তবে তা গ্রামীন অঞ্চলেই হওয়া উচিত। তাই গ্রাম বাংলাতেই স্বাধীন বাংলার রাজধানী স্থাপিত হল।

মুজিবনগরের একটি গ্রামীন আম্রকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। বহু দেশী বিদেশী সাংবাদিক সেখানে এসে জড়ো হলেন। সকলের সামনে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলো। রাষ্ট্রপতি হলেন জনাব শেখ মুজিবর রহমান। তিনি অন্তরীণ। তাই উপরাষ্ট্রপতি হলেন নজরুল ইসলাম। আর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহম্মদ। প্রধান সেনাপতি হলেন মেজর জেনারেল ওসমানী।

এইভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো।

অবশ্য অনেক নীতিবাগীশ নাক সিঁটকে বলবেন যে, এই সরকারের কি মূল্য? কিন্তু আজ অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি যে, স্বাধীন বাংলা সরকার অত ক্ষুদ্র নয় —এর বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু আজ প্রতিটি ভারতীয়ের মনে একটা প্রশ্ন জাগছে, তা হলো, ভারত সরকার এই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না কেন ?

আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি লোকের মনে এই এক প্রশ্ন—তা হলো ভরত সরকার কেন এই লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর, তবে বোঝা বহন করেও বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না ?

এর উত্তরে দুটি কথা বলেছেন ভারত সরকার। তার এই কথাকে গভীর মন নিয়ে বিচার করলে ঠিক অভ্রান্ত মনে হয় না। সেই দুটি কথা হলো ঃ

১। বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিলে পাক-ভারত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তার ফলে ভারতের কোনও সমস্যার সমাধান হবে না।

২। পাক-ভারত যুদ্ধে ভারত অতি সহজে জয়লাভ করতে পারবে বটে, তবে চীন, আমেরিকা প্রভৃতি বৃহৎ শক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। তার ফলে ভারতের বিরাট ক্ষতি হবে। এর ফলে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। তাতে ভারতের বুকে হবে বিরাট ধ্বংসলীলা। ভারতের ক্ষতি ভারত সরকারের কাম্য নয়।

এই দোদুল্যমান অবস্থায় দুলছে ভারতের মন। তাই ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পারছে না। তার ফলে কিন্তু ক্ষতি বেশি হচ্ছে ভারতের। কারণ ভারতের বুকে এসে জমছে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী। শরণার্থীদের বোঝা বয়ে বয়ে ভারত ক্লান্ত বিপর্যস্ত। ভারতের অর্থনীতির উপরে তারা বিরাট চাপ দিচ্ছে। তার ফলেই ভারতের দুরবস্থা চরমে উঠবে।

আসলে ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে অনেক আগে। সে যুদ্ধ হলো অর্থনৈতিক যুদ্ধ। তার ফলেই ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে চাপ পড়ছে বেশী। ভারতের অবস্থা হচ্ছে অসহায়।

বিশ্বের যে সব দেশ ভারত ভ্রমণে এসেছেন তাঁরাও বলছেন একই কথা।

কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন পাকিস্তানের পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের এটি স্বাধীনতা সংগ্রাম।

সেখানে কলেজের ছাত্রী রোশেনারা মাইন বুকে বেঁধে পাক ট্যাংকের সামনে প্রাণ দিয়েছেন। তার ফলে পাক ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে।

সেখানে চাষীর ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত বন্দুক হাতে পাক হানাদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা যে অদম্য সাহস দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না।

আজও মুক্তিযোদ্ধারা তৈরী হচ্ছে মুজিবনগরে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্যে। তাদের মনে অনমনীয় বল—তারা চায় সংগ্রামে জিততে—হারতে নয়।

তাদের মুখে এক কথা—

'জীবন-মরণ ভুলেছি আমরা
চাই স্বাধীন বাংলা চাই।
মরতে হয় প্রাণ দেবো মোরা,
তাতেও কোনও কসুর নাই॥'

এই সব অদম্য বীরত্বের দিকে তাকিয়ে আনন্দে ভরে ওঠে বুক। এই ত স্বাধীন দেশের নাগরিকের মতো মনোভাব। বাংলাকে ওরা স্বাধীন করবেই। সারা বিশ্বে প্রচার করবে বাঙালীর বীরত্ব গাথা।

* * *

একটি অবিশ্বাস্য অপূর্ব ঘটনা ঘটল এর পর।

কোলকাতায় বাংলার কূটনৈতিক মিশনের প্রধান হোসেন আলী ঘোষণা করলেন যে তিনি আর ভবিষ্যতে পাকিস্তানী কূটনৈতিক মিশনের লোক নন—তিনি হলেন বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক এজেন্ট।

পাক সার্কাসে তাঁর বাসভবনের উর্ধ্বে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করলেন। তাঁর ভবনের উর্ধ্বে তিনি উত্তোলন করলেন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব সহকারীরাও আনুগত্য স্বীকার করলেন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সরকারের প্রতি।

হোসেন আলী ঘোষণা করলেন—আমি বাঙালী, তাই বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রামে আমার আছে অকুণ্ঠ সমর্থন। আমি দুঃখিত যে এতদিন আমি স্বার্থবাদী পাকিস্তানী সরকারের প্রতি অনুগত হয়ে তাদের কাজ করেছি। আজ আমার কণ্ঠে একটি মাত্র ভাষা ধ্বনিত হচ্ছে—জয় বাংলা! শুধু আমি নই, আমার পরিবারের সকলে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অনুগত। আমি চাই বাংলাদেশ পশ্চিমী শাসন মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন সরকার গঠন করুক।

শুধু বাংলা নয়—দিল্লী, নিউইয়র্ক প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের পাকিস্তানী কূটনৈতিক মিশনের কর্মীরা পাকিস্তান সরকার তথা ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য। তাঁরা নিজ নিজ কর্মস্থানে প্রচার করবেন বাংলাদেশ সরকারের বাণী।

এইভাবেই সংগ্রাম চলেছে এগিয়ে। লক্ষ লক্ষ বাঙালী বিশ্বের যে যেখানে আছে, তারা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করছে।

* * *

আজ সারা ভারতের প্রতিটি পার্টি একটি কথাই বলে চলেছে—তা হলো অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

এই স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বড় কথা হলো, আজ সারা বিশ্বের

কূটনীতিক মহল যেন বিস্ময়ে স্তব্ধ—তা হলো ভারত স্বীকৃতি ও অস্ত্র সাহায্য দেবে কি দেবে না।

আজ সারা বিশ্ব জুড়ে চলেছে যে বিরাট রাজনৈতিক দাবা খেলা, তার মূল কেন্দ্র হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সরকার। বিশ্বের নানা দেশ আসছে ভারত পরিদর্শন করতে। তাদের একমাত্র কথা হলো, বাংলাদেশে কি ঘটেছে আর কি ঘটছে।

তাই আজ বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন নানা দেশের নেতৃবৃন্দ। কিন্তু আশ্চর্য—আজও এই দশ লক্ষ লোকের হত্যা আর আশী লক্ষ শরণার্থী দেখেও জাগলো না বিশ্বের বিবেক।

তার একমাত্র কারণ হলো; বিশ্বের কোন দেশকে ত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়নি—এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একমাত্র বাংলাদেশ তথা ভারত। ভারতের বুকে আজ আশী লক্ষ শরণার্থীর বোঝা।

তাই ভারত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। সে কিছু না বললে অন্য দেশ কিছু বলতে যাবে কেন ? তাই আজ অন্য দেশের কোনও মাথা ব্যথা নেই এ ব্যাপারে।

এ কথা যেন ভারত সরকার ভুলে না যান।

১০

আজকের দিনে একটা বড় প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের সমস্যা কোন্ দিকে?

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করেই বলেছিলেন কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে আমরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের নির্ধারণ নীতি গ্রহণ করব।

তারপরে বললেন—শরণ সিং বিদেশ থেকে ফিরে এলেই আমাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কিন্তু শরণ সিং এসে কোনও আশার বাণী শুনাতে পারলেন না।

প্রধানমন্ত্রী এখন কোনও পথ দেখতে না পেয়ে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী সভায় বললেন—এখনও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ব জনমত এখন আমাদের দিকে ভিড়ে আসছে।

পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রতি কি কোন কালেই আমাদের মোহভঙ্গ হবে না? একটা দেশে শাসন কর্তৃপক্ষের আদেশে বহু লক্ষ নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ নিষ্ঠুরভাবে পৈশাচিকভাবে নিহত হলো, হাজার হাজার নারী হলো ধর্ষিতা, আশী লক্ষ নরনারী নিজ নিজ প্রিয় বাসস্থান ত্যাগ করে বিতাড়িত হয়ে পররাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বাধ্য হলো—এসব এখনো চলছে—তবুও সারা বিশ্ব শুধু তাকিয়েই দেখছে, কেউ একটি দৃঢ় কথা বলছে না। ইয়াহিয়ার কাজের নিন্দা অনেকে করছে, কিন্তু তাকে জব্দ করবার নীতি কেউ গ্রহণ করছে না।

এই পাপিষ্ঠ দেশের পাপ রাজত্বকে আরও বলীয়ান করার জন্যে আমেরিকা এখনো অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিয়েই চলেছে। কিছুকাল

আগের কথাও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। আমেরিকার ভারতকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য দেবার কথা উঠলে তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডালেস সাহেব বলেছিলেন—না না, তা কি করে হবে ? তাতে যে আমাদের পরম বন্ধু পাকিস্তানের প্রতি স্বার্থ-বিরুদ্ধ কাজ করা হবে।

বিশ্ব বিবেক বলে যদি কিছু থাকে, তবে তাদের মুখ চেপে ধরেছে এবং হাত বেঁধে রেখেছে ঐ বিশিষ্ট কয়েকটি পাশ্চাত্ত্য জাতি। এমন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী কি আশা করেন তাঁদের কাছে ? বাংলাদেশকে সাহায্য না দেবার অজুহাত হিসাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে, পরের সাহায্য নিয়ে কোনও রাজ্য স্বাধীনতা লাভ করতে পারে না—বাংলাদেশকে নিজের শক্তির উপরে নির্ভর করতে হবে।

সে হিসাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হয়, তাহলে বর্তমানে আমাদের দেশের ওপর অর্থাৎ ভারতের ওপর যে বিপর্যয় এসে পড়েছে (অর্থনৈতিক বিপর্যয়) তার দুর্বহ দায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আমাদেরও নিজ বলে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে। পরের সাহায্যের প্রত্যাশী হয়ে বসে থেকে লাভ কি ?

একথা ভুললে চলবে না, যে ভিয়েৎনাম আজ আমেরিকার বিরাট শক্তি ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে নিজেরা সংগ্রাম করে বিশাল একটি বিশ্বশক্তি আমেরিকাকেও বিপর্যস্ত করে তুলেছে—তারাও চীন ও রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে। এমন নজীর বিশ্বের ইতিহাসে প্রচুর। ইস্রায়েল যে সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রদের যুদ্ধে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে, তারাও সাহায্য পেয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়া পরামর্শ দিয়েছেন, বিশ্বের সব জাতি যদি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাহলে আমাদের উচিত হবে, সকল জাতির কাছ থেকে আমরা যে ঋণ নিয়েছি, সেই ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করা। কিন্তু রাজাজী, এঁরা হলেন উত্তমর্ণ, আমরা অধমর্ণ, তাই আমাদের অদৃষ্ট এঁদের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

আমাদের সরকার যদি যথেষ্ট বলীয়ান হতো, তবে তাদের পক্ষে সম্মিলিত জাতিসংঘ পরিত্যাগ করে চলে আসা উচিত—এটাই একমাত্র সঙ্গত প্রতিবাদ।

যাই হোক, এক সময়ে সকলেই এসে পড়বেন পাকিস্তানের এই সংঘর্ষের ক্ষেত্রে—বিবেকের তাড়নায় নয়, চক্ষুলজ্জা ও স্বার্থের খাতিরে। বিশ্বশান্তি সংস্থা (ওয়ার্ল্ড পিস্ কমিটি) তাদের দেশে অবস্থিত ৫—২০টি শাখার প্রতিনিধি পাঠাবেন দিল্লীতে, বাংলাদেশের প্রতি আস্থা ও আন্তরিক সমর্থন জানাবার জন্যে।

সম্মিলিত জাতি সংস্থার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের প্রতিনিধিরা আসবেন শরণার্থীদের সমস্যা বিবেচনার জন্য। রাষ্ট্র প্রধানেরাও আসবেন নানা দেশ থেকে। ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড ও ক্যানাডা ঘুরে গেছেন ও তাঁরা আমেরিকার নিন্দা করেও গেছেন—বাংলাদেশকে সমর্থনও জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কি করবেন—বা কতটুকু করতে পারেন আমাদের জন্যে তাও চিন্তা করা উচিত।

সম্প্রতি ভারতে আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোল্‌জ তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, আমাদের (আমেরিকার) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কথা ভাবতে হলে ভারতবর্ষ, সিংহল এবং যদি বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দাঁড়িয়ে যায় তা হলে বাংলাদেশের কথাও ভাবতে হবে। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশ চেষ্টার বোল্‌জের ভাবনার বাইরে নয়। অবশ্য এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত।

বিশ্বের সকল দিক থেকে সকলে এসে কি করছে সেজন্য ভারত উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ভারতের একথা ভুললে চলবে না, যে তার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। পাকিস্তান তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সেখানকার নওজোয়ানরা মুক্তিফৌজের হয়ে লড়াই করে লাখে লাখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাদের স্বীকৃতি দেওয়া, তাদের হাতে অস্ত্র ও খাদ্য তুলে দেওয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্য।

আজ সারা ভারতের লোক তাই উৎকণ্ঠিত। তাদের উৎকণ্ঠা দুটি কারণে। প্রথম কারণ হলো ভারত কি করবে বা কি রতে পারে, দ্বিতীয় কারণ হলো বিশ্বমত কোন্ দিকে যাচ্ছে বা যেতে পারে।

চীন সম্পর্কে আমাদের একটা অহেতুক ভীতি আছে। কিন্তু এ ভীতি থাকত না, যদি চীনের সঙ্গে আমরা স্বাভাবিক বা সৌজন্যমূলক কূটনীতির সম্পর্ক রাখতাম। ভারত যখন গোয়া দখল করেছিল, তখন বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে চীনও সম্মতি জানিয়েছিল। চীন তাই পাকিস্তানকে আজ যে অস্ত্র দিচ্ছে, তা দিচ্ছে ভারতের প্রতি রাগ বা বিরক্তির জন্যে—আসলে ইয়াহিয়া খাঁর প্রতি তার এমন কিছু গভীর দরদ নেই যার জন্যে সে একাজ করতে পারে।

চীন জানে, যে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে রাশিয়া প্রভৃতি বহু দেশ ভারতে সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তার ফলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়বে।

তাছাড়া চীন জানে, তাকে যুদ্ধ করতে হলে হিমালয় ডিঙ্গিয়ে কষ্ট করে আসতে হবে। ভারতে আজকের শক্তি আর ১৯৬২ সনের শক্তি এক নয়—বরং তার দশগুণ বললেও বেশি বলা হয় না। তাই চীন ইয়াহিয়ার জন্যে এত বিপদের ঝুঁকি নিজের মাথায় কখনো নিতে যাবে না। চীন এখন নিজেকে শক্তিশালী করতেই ব্যস্ত—নিজেকে শক্তিহীন করতে সে যাবে না।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে চীনের মতের ও পথের কোনও মিল নেই। চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ—ইয়াহিয়া ধর্মান্ধ করে আফিং খাইয়ে রাজত্ব তথা ডিক্টেটারী চালাতে চায়। চীনের কাছে এই ধর্ম হলো আফিং বা Opium। তাই চীনের সঙ্গে তাদের গোড়ায় কোনও মিল নেই।

ইয়াহিয়ার প্রতি চীনের এই দরদ ও অস্ত্র সাহায্যের অন্য অর্থও থাকতে পারে। তা হলো রণমত্তে মত্ত ইয়াহিয়া চৈনিক কিছু অস্ত্র

পেয়ে গরম হয়ে রণের হুংকার দিক এবং তারপর ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে ধ্বংস হোক। তাই চীনের রাজনীতির দাবাবোড়ের চাল বোঝা খুব কঠিন। বিশেষ করে সম্প্রতি নিক্সনকে চীনে আমন্ত্রণের মধ্যে তা আরও জটিল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তাই মনে রাখবে হতে, চীন ভীতি অমূলক। ভারত যদি সাহসী হয়ে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়, তবে তার ফল ভালই হবে।

* * * *

মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে—যুদ্ধ তবু চলছে। এ যুদ্ধ চলবেই। তার কারণ হলো বাংলাদেশ সরকারের সংকল্প কিছুতেই তারা নিজেদের মর্যাদার হানি করে আত্মসমর্পণ করবে না। মুক্তিফৌজরা যুদ্ধ চালিয়েই যাবে। মুক্তিফৌজের মনোভাব অনমনীয়। যে সব ঘাঁটি থেকে তারা এককালে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল, সেই সব ঘাঁটি আবার উদ্ধার করছে তারা। বর্ষার শুরু থেকে আবার তারা প্রচণ্ড মার দিচ্ছে খান সেনাদের।

মুক্তিফৌজের এই সংগ্রাম দুদিক দিয়ে পরিচালিত হয়ে চলেছে। একটি হলো সামনাসামনি অর্থাৎ চারদিকের বর্ডার থেকে তাদের আক্রমণ। অন্যটি হলো গরিলা যুদ্ধ। হাজার হাজার গরিলা বাহিনী ছেয়ে আছে পাকিস্তানে। তাদের চেনা যায় না বাইরে থেকে—তবে তারা সুযোগ মত বের হয়ে প্রচণ্ড আঘাত করছে খান সেনাদের রাতের আঁধারে। ভোরবেলা আর তাদের চেনা যায় না।

বাংলাদেশের জনগণও তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন অনেকে গোপনে। এই গরিলা বাহিনী ধর্মান্ধ যে সব লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছে বা লুটপাট করছে সেই সব গুণ্ডা ও রাজাকারদেরও গোপনে খতম করছে। তাই আজ ধর্মান্ধ মুসলীম লীগ ও রাজাকারদের বিপদ দুদিক থেকে। কারণ তারা বাঙালী। তাছাড়া তাদের মধ্যে কে মুসলীম লীগ আর কে আওয়ামী লীগ তা

চেনা যায় না। আর তাদের পেছনে আছে গরিলা বাহিনী—যারা সুযোগমত তাদের খতম করে চলেছে।

মুক্তিফৌজরা আবার ধীরে ধীরে নানা ফ্রন্টে সাফল্য অর্জন করছে। তার কারণ হলো, ইয়াহিয়া খাঁর অস্ত্রশস্ত্রের বল এখন অনেক স্তিমিত। বাধ্য হয়ে সে আমেরিকার দ্বারে ধর্ণা দিয়েছে। আর তার সৈন্যও বাংলাদেশে কম খতম হয়নি। গত চার মাসে ১২ হাজারেরও বেশি খান সেনা খতম ও ২৫।৩০ হাজার হয়েছে জখম। জখমী সেনারা আর লড়াই করতে পারবে না। তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করার চেষ্টা করছে ইয়াহিয়া—কিন্তু পশ্চিমী সমরনায়করা আপত্তি করে চলেছে।

পশ্চিমী সমরনায়করা বলছে, বাংলাদেশে আরও সৈন্য পাঠালে পশ্চিম পাকিস্তান একেবারে দুর্বল হয়ে পড়বে। তাতে পূর্ব পশ্চিম কিছুই বাঁচতে পারে না। তাই আর সৈন্য পাঠানো উচিত নয়।

তাছাড়া অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা যে কতো দুর্বল তাও বোঝা যায় একটা ব্যাপারে। বাধ্য হয়েই তারা আজ একশো টাকা ও পাঁচশো টাকার নোট তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমের ধনীদের কাছ থেকে ঢালাও অর্থ সাহায্য নেওয়া হচ্ছে প্রায় জোর করে। তাছাড়া বিশ্ব ব্যাঙ্ক সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ইয়াহিয়ার সামনে বিপদের সীমা পরিসীমা নেই। যতোই তিনি হুংকার ছাড়ুন তাঁর অবস্থা এখন জলমগ্ন হবার আগের মুহূর্তের লোকের মতোই।

সারা দুনিয়ার বদনাম ও ধিক্কার কুড়িয়ে পাকিস্তানকে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী নাগরিক ধ্বংস করে ইয়াহিয়া এখন পাগলের প্রলাপ বকে চলেছেন। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সে হুমকি যে কতো অন্তঃসার শূন্য তা ভারত কেন, সারা বিশ্বই ভাল করে জানে।

তাই যতো বাড়ছে মুক্তিফৌজের আক্রমণ তত দিশেহারা হয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন ইয়াহিয়া।

১১

ইয়াহিয়া খাঁর মিথ্যাচারের আর একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে সম্প্রতি। সেই ঘটনাটি হলো কূটনৈতিক মিশন সংক্রান্ত বিষয়।

কোলকাতায় পাক সরকারের যে দূতাবাস ছিল, জনাব হোসেন আলী তাঁকে বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতের ঢাকাস্থ কূটনৈতিক দপ্তর বন্ধ করে ভারত সরকার তাঁর মিশনের কর্মীদের এদেশে ফিরিয়ে আনবেন স্থির করলেন। কিন্তু তাঁদের গৃহবন্দী করে রাখলেন ইয়াহিয়া। তিনি বললেন—কোলকাতার জনাব হোসেন আলী ও তার লোকজনদের ভারত সরকার আটকে রেখেছেন। রাষ্ট্রসংঘে একথা উঠল। তখন তারা একজন সুইস প্রতিনিধি পাঠালেন—তিনি এসে জনাব হোসেন আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি পাকিস্তানে যাবেন কিনা।

এতে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছেন ইয়াহিয়া খাঁ। বাংলাদেশই আমাদের দেশ—পাকিস্তান নয়। সাফ বলে দিয়েছেন কলকাতার বাংলাদেশ মিশনের কর্মীরা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের পালা সমাপ্ত। মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সুইস প্রতিনিধি ডঃ বোনারড। সাক্ষী ছিলেন প্রাক্তন পাক ডেপুটি হাইকমিশনার মাসুদ—এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের অশোক রায়।

পঁয়ষট্টিজন বাঙালী কর্মীর মধ্যে চৌষট্টিজনের কাছ থেকে মিলেছে সাফ জবাব তাঁরা বলেছেন—স্বেচ্ছায় তাঁরা নিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য। কোন অবস্থাতেই ফিরবেন না পাকিস্তানে। একজন আছেন ছুটিতে। তাঁর সম্ভাব্য জবাব সম্পর্কে নেই কোন জল্পনা কল্পনার অবকাশ।

বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হোসেন আলির আচরণ প্রশংসার যোগ্য। নিঃসন্দেহে তিনি বাড়িয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের মর্যাদা। কোন কিছুই বলার নেই ইসলামাবাদের। অনাবশ্যক জল ঘোলা করেছিলেন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত এই ঘোলা পানিই খেতে হয়েছে তাঁদের।

বাংলাদেশ মিশনের কূটনৈতিক কর্মীরা দুনিয়ার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ইসলামাবাদ কত বড় মিথ্যাবাদী। ওদের প্রচারযন্ত্র কতখানি সত্যভ্রষ্ট। জনগণকে ধোঁকা দেবার কি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

প্রাক্তন পাক ডেপুটি হাইকমিশনের বাঙালী কর্মীদের আনুগত্যের পরিবর্তন বাইরের কোন যাদুমন্ত্রে হয়নি। ওটা ঘটিয়েছে গণহত্যাকারী পশুরা। স্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সৃষ্টি।

তার ইন্ধন জুগিয়েছেন আয়ুব খান নিজে। ভারতের ছিল না কোন ভূমিকা। মানবতার খাতিরে সে দিয়েছে শরণার্থীদের আশ্রয়। জড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে।

শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত পাঠাবার জন্যই তা দরকার। এই সহজ সত্য গুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইয়াহিয়া খান। তাঁর অভিযোগ প্রাক্তন পাক কূটনৈতিক কর্মীরা স্বেচ্ছায় করেননি আনুগত্যের বদল।

ওটা জোর করে চাপান হয়েছে তাদের উপর। সত্যিকারের উস্কানিদাতা ভারত। এই মিথ্যা অভিযোগের ফলে ঢাকায় প্রাক্তন ভারতীয় মিশনের একশ ত্রিশজন কূটনৈতিক কর্মী আজ পাক জঙ্গীশাহীর গৃহবন্দী।

মিশন গুটাবার পরও ফিরে আসতে পারছেন না তাঁরা ভারতে। বর্বরদের হাতে পদে পদে হচ্ছেন লাঞ্ছিত। অপরাধী ইয়াহিয়া খান আর তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করছেন ঢাকার ভারতীয় কর্মীরা।

কেন্দ্রীয় সরকার অহেতুক সৌজন্য দেখিয়েছিলেন ইসলামাবাদের চাঁই মাসুদকে।

ঢাকার বর্বরতার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া উচিত ছিল কলকাতায়। যতটুকু তাঁরা নিয়েছিলেন তা খুবই হাল্কা। আন্তর্জাতিক শিষ্টাচারের উপর যাদের আস্থা তাদের সম্পর্কে পাল্টা শিষ্টাচার প্রযোজ্য। যাদের তা নেই তাদের প্রাপ্য গলা ধাক্কা। এ দাওয়াই ছাড়া কখনই সায়েস্তা করা যায় না দুর্বিনীতদের। সবার মনে জেগেছে গভীর প্রত্যাশা। ঢাকার কর্মীরা ফিরে আসবেন ভারতে। কলকাতার প্রাক্তন পাক মিশনের অবাঙালী কর্মীরা যাবেন পাকিস্তানে। এই বিনিময়ের পথে নেই কোন দৃশ্যমান বাধা।

কিন্তু শয়তানের অবতার ইসলামাবাদ। নিত্য নূতন ফ্যাকড়া তুলতে তাঁরা ওস্তাদ। আবার কোন ওজর আপত্তি আসবে কিনা বলা মুস্কিল। প্রচণ্ড চপেটাঘাতের পর অবশ্যই বন্ বন্ করছে ইয়াহিয়ার মাথা। ঠাণ্ডা হলে ওখান থেকে হয়ত বেরুবে আর একটি শয়তানি চাল।

ঢাকার কর্মীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না কোনমতেই। নয়াদিল্লীর প্রয়োজন বেশী পরিমাণ সতর্কতা। অবাঙালী সঙ্গীদল সহ মাসুদের কলিকাতা ত্যাগ এবং ঢাকার ভারতীয় কূটনৈতিক কর্মীদের ভারতে প্রত্যাবর্তন। ঘটাতে হবে একসঙ্গে। অন্যথায় মাসুদ এবং তাঁর সঙ্গীরা পাবেন না স্বদেশ-গমনের ছাড়পত্র।

দরকার পড়লে নয়াদিল্লীকে হতে হবে আরও কঠোর; বাইরের দুনিয়া এবং বৃহৎ শক্তিগুলো এখন কি করবে? পাক শয়তানি এবং মিথ্যার বেসতি ধরা পড়ার পরও কি তারা থাকবে নিস্ক্রিয়?

যাদের কথার নেই কোন দাম, সত্য গোপনে যাদের উদ্দাম আগ্রহ এবং ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে যাদের চিরাচরিত অভ্যাস তাদের শাসনে কি ফিরে যেতে পারেন শরণার্থীরা? পাক সুহৃদদেরই বা বলার কি আছে?

চোখের সামনে দেখলেন তাঁরা বাংলাদেশ মিশনের কর্মীদের অকম্প প্রতিজ্ঞা।

শতছিন্ন ইয়াহিয়ার প্রচারের মুখোস। বেড়িয়ে পড়া মিথ্যাচারীর নগ্ন মূর্তি। এর পরও কি তাঁরা বলবেন—ইসলামাবাদ সভ্য সরকারের পদবাচ্য? যদি বলেন, তাতে ক্ষতি নেই।

সবাই জানে—চোরের মাসতুতো ভাই গাঁটকাটা। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও থামবে না বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। অখণ্ড পাকিস্তানের অপমৃত্যু ঘটেছে অনেক আগেই। বাকী আছে শুধু মাটি চাপা দেওয়া। ওটা করবেন বাংলাদেশ সরকার।

* * *

লড়াইএর হুমকি দিয়েছেন ইয়াহিয়া খান। তিনি বলছেন—পূর্ব পাকিস্তানের কোন অঞ্চল দখলের চেষ্টা যদি করে ভারত, তবে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

বাংলাদেশে পাক চমূর নারকীয় তাণ্ডবের প্রথম পর্যায়ে বন্যার স্রোতের মত এদেশে আসছিলেন শরণার্থী। কোন কোন বেসরকারী মহল থেকে তখন উঠেছিল দাবী—দখল কর সীমান্ত এলাকার গোটাকয় পাক-জেলা।

সেখানে সাময়িকভাবে বসাও শরণার্থীদের। অবস্থা স্বাভাবিক হলেই ফিরে যাবেন তাঁরা নিজেদের ঘরে। এ দাবীর উপর কোন গুরুত্ব দেননি নয়াদিল্লী।

আপন ঘাড়ে নিয়েছিলেন তাঁরা শরণার্থীর বোঝা। ইসলামাবাদের সুবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য দিচ্ছিলেন বিশ্ববিবেকের গোড়ায় সুড়সুড়ি। এসব ঘটনা পুরাণো। তারপর জল গড়িয়েছে বহু দূর। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার।

মুক্তিফৌজ চালাচ্ছেন গেরিলা লড়াই। যতই দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে তাঁদের সংগ্রামের তীব্রতা। এখন ভারতের পক্ষে পূর্ব

পাকিস্তানের কোন অঞ্চল দখলের প্রশ্ন আসে না। কারণ পূর্ব পাকিস্তান আর নেই। সেখানে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

এ সরকারকে অবশ্য নয়াদিল্লী দেননি কূটনৈতিক স্বীকৃতি। কিন্তু তাদের সংগ্রামকে জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন। বাংলাদেশে পাক বাহিনী প্রকৃতপক্ষে বিদেশী দখলদার বাহিনী। ওখানে থাকার কোন নৈতিক অধিকার নেই তাদের। যাঁরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাঁদেরই প্রাপ্য বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই মুক্তিফৌজ চালাচ্ছেন আপোষহীন সংগ্রাম। কোন বিশেষ অঞ্চলের মুক্তি ইপ্সিত নয় ভারতের, গোটা বাংলাদেশের মুক্তিই তার কাম্য।

ইয়াহিয়া খান যদি মাস তিনেক আগে যুদ্ধের হুমকি দিতেন তবে তার একটা অর্থ বোঝা যেত। তখন ভারতের বেসরকারী মহল থেকে সত্যিই উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তানের একটা অঞ্চল দখলের দাবী।

পাক-ডিক্‌টেটর এতদিন চুপ করে বসেছিলেন। টুঁ শব্দটি করেন নি। এখন হয়েছে অবস্থার পরিবর্তন। বেড়েছে মুক্তিফৌজের মারের মাত্রা। মুক্ত অঞ্চলের প্রসার ঘটতে দেরী নেই। এ অবস্থায় নয়াদিল্লী কেন দখল করতে যবেন বাংলাদেশের কোন একটা অঞ্চল। শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের পথ প্রতিদিন পরিষ্কার করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার।

মনে হয়, প্রমাদ গুণছেন ইয়াহিয়া খান। মুক্তিফৌজের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না তিনি। হয়ত সামনে দেখতে পাচ্ছেন ভয়াবহ চিত্র। দুনিয়ার দৃষ্টির মোড় ঘুরাবার জন্য তিনি সুরু করেছেন শয়তানির পাঁয়তারা। খুঁজে বেড়াচ্ছেন ভারতের সঙ্গে লড়াই বাধাবার ফিকির। তিনি হয়ত বলতে চাইছেন—মুক্তিফৌজের নামে যাঁরা লড়াই করছেন তাঁরা আসলে ভারতীয় সৈন্য।

ওদের মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টির অর্থ ভারতের পাক-ভূমি দখল। তাই আগেভাগেই দিয়ে রাখলেন হুঁশিয়ারী। এবারের সম্ভাব্য লড়াই-এ

তিনি নাকি একা নন। অপর সুহৃদরাও নাকি দাঁড়াবেন এসে তাঁর পাশে। নাম বলেন নি তিনি কোন দোস্তের।

হয়তো তার হুমকির আড়ালে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে চীন। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত লড়াইএর সময় পিছন থেকে ভারত আক্রমণের চরম পত্র দিয়েছিলেন পিকিং। সে কথা স্মরণ করেই চুটিয়ে ব্ল্যাক-মেইল করেছেন ইয়াহিয়া খান। প্রেসিডেন্ট নিকসনের চীন সফরের ঘোষণার পর তাঁর আস্ফালনটা যাচ্ছে মাত্রা ছাড়িয়ে। আমেরিকা নজর রাখুন এই দানবের উপর। একবার ভাবুন—কার হাতে যাচ্ছে মার্কিণ-অস্ত্র। এ অস্ত্রের ব্যবহার হবে কার বিরুদ্ধে?

গোড়াতেই মহা ভুল করেছেন নয়াদিল্লী। দুনিয়ার দরবারে ধর্ণা দিতে গিয়ে অযথা হয়েছে সময় নষ্ট। বাংলাদেশে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের পথ আপাতত বন্ধ।

ইয়াহিয়া খান অনড় এবং আগের চেয়েও বেশী দুর্বিনীত। সামরিক আদালতে তিনি করবেন মুজিবর রহমানের গোপন বিচার। তাঁর অপরাধের পাল্লা নাকি এত ভারী যে মৃত্যুদণ্ডও সম্ভব।

তবে একমাত্র ভরসা ইয়াহিয়া নিজে। তিনিই করতে পারেন সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ড মকুব। এই সদাশয় ডিক্টেটর অন্ধকারের জীব। দিবালোকে তাঁর প্রচণ্ড ভয়। মুজিবরের প্রকাশ্য বিচার হলে এবং বিদেশী কৌঁসুলী উপস্থিত থাকলে জেরার মুখে বেড়িয়ে পড়বে পাক-চক্রীদের পৈশাচিক কীর্তি কাহিনী। তাই প্রকাশ্য আদালত একেবারেই বারণ।

জঙ্গীশাহীর এক্তিয়ারের বাইরে বিদেশী উকিলের উপস্থিতিও নিষিদ্ধ। এ সুযোগ কিছুতেই পেতে পারেন না ইয়াহিয়া খান। প্রথমেই দরকার বাংলাদেশে তাঁর সন্ত্রাসবাদের অবসান। ক্রমবর্ধমান শরণার্থীর বোঝা অনন্তকাল বইতে পারে না ভারত।

ওদের ফেরত পাঠাতে হবে নিজেদের বাড়ীঘরে। খুবই সাফাই

গেয়েছেন গণহত্যার ধিকৃত পাক-নায়ক। বাংলাদেশে তিনি ডেকেছেন রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক দলকে। তাঁরা দেখবেন শরণার্থীরা পাচ্ছেন কিনা প্রত্যাশিত নিরাপত্তা।

যদি এই নিরাপত্তা না আসে পর্যবেক্ষক দল কি করবেন? বিশ্বসভায় শরণার্থী হাইকমিশনার প্রিন্স সদর-উদ্দিন আগা খান স্পষ্টই বলেছেন—রাষ্ট্রসংঘ দিতে পারেন না বাংলাদেশে কারও নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

ইতিপূর্বে যেসব বিদেশী প্রতিনিধিদল সফর করেছেন এ-অঞ্চল তাঁদের মতে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের প্রতিকূল। যাঁরা ঘরবাড়ী ফেলে এসেছেন তাঁদের বিষয়-সম্পত্তির বেদখল প্রায় সম্পূর্ণ।

সৈন্যরা গুলী চালাচ্ছে অবাধে। কিন্তু ইয়াহিয়া বলছেন—সব ঠিক হয়ে গেছে। উৎসুক নয়নে চেয়ে আছেন তিনি শরণার্থীদের ফিরে আসার জন্য। কোন্ নির্বোধ বিশ্বাস করবেন এই নরঘাতককে?

মিথ্যার মুখোস বার বার খসে পড়েছে। নির্লজ্জের মত তা কুড়িয়ে নিয়ে আবার মুখে আঁটছেন ইসলামাবাদ। নয়াদিল্লী জেনে রাখুন—শান্তির পথে আসবে না বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান। শান্তি আনতে পারতেন মুজিবর রহমান এবং আওয়ামী লীগ।

আর তাঁদেরই বিচার প্রহসনের ফিকিরে আছেন ইয়াহিয়া খান। সঙ্গে সঙ্গে আসছে ভারতের উপর যুদ্ধের হুমকি। ইতস্ততর সময় নেই। নয়াদিল্লী তৈরী হোন।

স্বীকৃতি দিন বাংলাদেশ সরকারকে। সামরিক সাহায্য যাক্ মুক্তিফৌজের হাতে। শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্যই তা দরকার। ইয়াহিয়া যদি যুদ্ধ ঘোষণা করতে চান করুন। সমরক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে হবে মোকাবিলা। ইয়াহিয়ার পূর্বসূরী আয়ুব খান দেখেছেন যুদ্ধের

পরিণাম। বাকি আছেন ইয়াহিয়া খান। তাঁরও রণসাধ মেটান দরকার।

* * *

গত কিছুকাল ধরে বাংলাদেশের নানা যুদ্ধ অঞ্চল থেকে কোনও রোমাঞ্চকর খবর আসছে না। শুধু যুদ্ধ চলছে ত চলছেই। দু পক্ষেই হতাহত হচ্ছে। তবে মুক্তিযোদ্ধারা সব সময় আত্মগোপন করে আচমকা গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করছে।

বাংলাদেশের অনেকের মনে তাই মুক্তিযোদ্ধাদের জয় সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে।

ভারতের প্রাক্তন সেনাপতি জে. এন্. চৌধুরী এই যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মতে পাকিস্তানী মডার্ণ আর্মি সুপরিকল্পিত ভাবে যুদ্ধ শুরু করেছে ও যুদ্ধ চালাচ্ছে। কিন্তু মুক্তি যোদ্ধারা ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাই তাদের সুবিধা করে ওঠা খুব কঠিন।

এই লেখাটি পড়ে অনেকের উৎসাহ হয়ত খুব কমে গেছে।

কিন্তু তিনি একটা কথা লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে এই যুদ্ধ খুবই দীর্ঘস্থায়ী হবে—চট করে কোনও পক্ষ জিততে পারবে না।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে সবার আগে। তা হল তিনি একজন প্রাচীন সৈনিক তাই তিনি আধুনিকতম অস্ত্রের ভয়াবহতা এবং যুদ্ধ বিজ্ঞানের চিরাচরিত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির দ্বারা তিনি পাকিস্তানী বাহিনীর আক্রমণ পর্যায় বিচার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি এই যুদ্ধে পাকিস্তানী হানাদারদের শক্তি বেশি তাই বিচার করে এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। আধুনিক যুদ্ধের কেতাবী বিচার দ্বারাই তাঁর সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে।

তাই তিনি বা তাঁর মত অন্য যে কোন সৈনিকের বিচারে ইয়াহিয়া খাঁ বাহিনীর শক্তি বেশী বলে প্রতীয়মান হতে বাধ্য।

একথা গোপন করে লাভ নেই যে শেখ মুজিবর রহমান, তাঁর পার্টি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কিংবা তাঁদের সমর্থক জনসাধারণ কেউই পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর এমন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের জন্যে তৈরী ছিলেন না।

সামরিক বাহিনীকে সামরিক কায়দায় প্রতিরোধ করার কোনও রণনৈতিক পরিকল্পনাও তাঁদের ছিল না। ওদের হাতে সৈন্য, অস্ত্র এমন কি উপযুক্ত পরিমাণে গোলাবারুদ পর্যন্ত ছিল না।

তাই এটা সাধারণ ভাবে মনে হতে পারে যে এই অসম যুদ্ধের ফলাফল সমান হবে না। প্রকৃত পক্ষে এটা কোনও যুদ্ধই নয়। এটা হল মারণাস্ত্রবাহী একটা আধুনিক সৈন্যবাহিনীর নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ মাত্র।

তাই এতে প্রথমেই ঘটেছে নিছক হত্যাকাণ্ড ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা।

কিন্তু ইয়াহিয়া খানের পাক ফৌজেরা কেবল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে তাদের নৃশংসতা সীমীত রাখেনি।

ইয়াহিয়ার সেনারা টেরার বা ত্রাস সৃষ্টি করে সমগ্র জনসাধারণের মেরুদণ্ড ও নৈতিক বলকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করেছে। তারা ঘরবাড়ি মন্দির, মসজিদ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেছে, পুড়িয়েছে—শত শত নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করেছে এমন কি নারী নির্যাতনের জন্যে পৃথক শিবির পর্যন্ত খুলেছে।

এর দ্বারা তারা যে আতংক সৃষ্টি করতে পারেনি তা নয়—প্রচুর ভাবে তা করেছে। তার প্রমাণ ভারতের বুকে ছুটে আসা লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী।

কিন্তু এতে ফল হয়েছে উল্টো। মানুষের মনের তীব্র একনিষ্ঠতা, শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা এতে আরও অনেক বেড়েছে।

তাই জেনারেল জে, এন, চৌধুরীর কথা মানতে হলে বলতে হয়, পৃথিবীতে কোনও নিরস্ত্র জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম করে লাভ নেই।

কিন্তু আমরা চোখের সামনেই দেখেছি নিরস্ত্র ভারতবাসী মুক্তি সংগ্রামে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের সমস্ত পরাধীন, দুর্বল ও নিরস্ত্র জাতিগুলি বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি পরাক্রান্ত ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির প্রচণ্ড সামরিক শক্তিকে অতিক্রম করে একে একে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই টেরার বা আতংক সৃষ্টি করে দমন করে রাখতে চেষ্টা করেছে। আমাদের ভারতে পর্যন্ত ঘটেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, আরও কত হত্যাকাণ্ড। কিন্তু এই সব হত্যাকাণ্ড থেকেই বৃটিশের পতন শুরু হয়েছে।

তাই মুজিবের ও আওয়ামী লীগের সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী স্তরে যখন নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মত বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র পাল্টা আক্রমণ শুরু হচ্ছে প্রধানত গেরিলা কায়দায়, তখন একদিন তার ফলাফল পাকিস্তানী দস্যুদলের পক্ষে মারাত্মক হবে।

তারা মরছে মরবে। এইভাবে তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন কমে আসছে। পাকিস্তানী হানাদাররা এর পরিণতি বুঝতে পারছে। তাই মাঝে মাঝে তারা করাচীর কাছে আরও সৈন্য ও অস্ত্রের জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু সেখানে আর কত সৈন্য আছে? তাদের ভাণ্ডার যে প্রায় শূন্য।

নেতাজীর আজদ হিন্দ ফৌজ পরাক্রান্ত বৃটিশ ও আমেরিকার সঙ্গে লড়াই করেছে। আর এতো অতি সামান্য পশ্চিমী পাক সৈন্য যাদের আর্থিক বল অতি সীমিত—যোগাযোগ বিপর্যস্ত।

চূড়ান্ত কালে যেমন নেতাজীর পক্ষেরই জয় হয়েছিল, সেদিন বৃটিশ হাত গুটাতে বাধ্য হয়েছিল, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের ও জনগণের

এই যুদ্ধও একদিন পাকিস্তানী দখলদারী শক্তির এবং রাজনৈতিক প্রভুদের চূড়ান্ত পতন ঘটাবে।

একথা সত্য যে, পাকিস্তানী সরকারী সামরিক বাহিনী নিখুঁত পরিকল্পনা দ্বারা আতর্কিতে আক্রমণ সুরু করেছে। কিন্তু সুদীর্ঘ ছয় সপ্তাহের সমান আক্রমণ ও নরহত্যার পরেও পাক বাহিনী বা পাক সরকারের অভীষ্ট লাভ হয়নি। বাংলাদেশ আজও বশ মানেনি। দিকে দিকে চলছে সমানে অতর্কিত আক্রমণ ও পাক ফৌজ ধ্বংস।

এখানে একটা কথা। যুদ্ধ শুধু যুদ্ধের জন্য নয়—কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে ইয়াহিয়া খাঁ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই প্রচণ্ড আঘাতের ফলে অজস্র মানুষের রক্তের ভেতর দিয়ে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র ও নতুন লোকায়ত্ত সরকার গড়ে উঠেছে।

একথা মনে রাখতে হবে যে ১৯৫৪ সনে দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধে হোচিমিনের সামান্য অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল বিরাট শক্তিশালী ফরাসী বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষা যেন আমরা ভুলে না যাই। জনসাধারণ যদি বিচ্ছিন্ন না হন, যদি তাঁরা নৈতিক বল অটুট রাখেন, তাহলে স্বাধীন বাংলা দেশের জয় অনিবার্য। একমাত্র ট্যাঙ্ক, মর্টার, বম্বার আর জেনারেলরাই যুদ্ধের শেষ নিয়ামক নন। জনতার সংহতি ও যোদ্ধাদের মনোবলই শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত জয় পরাজয় নির্ধারণ করতে বাধ্য। তার সবচেয়ে বড় কারণ হল এটা মুক্তিযুদ্ধ এটা ন্যায়ের যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ।

১২

বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮০ লক্ষ নরনারী বাস্তুত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছেন। আরও হাজার হাজার লাখ লাখ শরণার্থী দেশত্যাগ করে চলেছেন।

ভারতের ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম বা পশ্চিমবঙ্গ সন্নিহিত সীমান্ত এলাকায় যারা অতি সম্প্রতি ঘুরে এসেছেন, তাঁরাও বলেছেন যে, পাক বাহিনীর অত্যাচারে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান নির্বিশেষে বাঙালীদের দেশত্যাগ হ্রাস পায়নি। বন্ধ হওয়া ত দূরে থাক।

গত ৩রা জুন তারিখে আমিও সপরিবারে দেশত্যাগ করে ত্রিপুরা রাজ্যের সোনামুড়া সীমান্ত ফাঁড়িতে উপস্থিত হই। আমার সঙ্গে ছিলেন কমপক্ষে পাঁচশো পরিবার। সেদিনই তাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। সোনামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার মানুষ। বহু বছর আগে ভারতীয় নাগরিক হয়েছেন। আমাকে শরণার্থীদের প্রবেশ তালিকা দেখিয়ে বললেন, আপনাদের এটি ফরম পূরণ করতে হিমসিম খাচ্ছি। আমার ষ্টাফ কম। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের অবস্থা।

অবস্থা নিজের চোখেই দেখছিলাম। থানার আঙ্গিনা, ট্যাক্সিষ্ট্যাণ্ড, রাস্তা, গাছতলা, দোকান ও বাড়ী ঘরের বারান্দা সব যেন শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়েছে। প্রচণ্ড রোদে গাছতলায় মায়ের কোলে ধুঁকছে শিশু। ক্ষুধায় চীৎকার জুড়েছে। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। ভারতে যে হারে লোক আসছে, তার সঠিক হিসাব রাখা এ পর্যন্ত

সম্ভব হয়েছে, আমার তা মনে হয় না। এই বিপুল বিশাল জনস্রোতের পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সোনামুড়া ফাঁড়িতে বসে এই আশ্রয়হীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষের বিরাট মিছিলের দিকে তাকিয়ে আমি সেইদিন ভাবছিলাম, কত বড় মিথ্যাবাদী হলে ইয়াহিয়া সরকার প্রচার করতে পারেন, শরণার্থীদের সমস্যা নিয়ে ভারত সরকার অতিরঞ্জিত প্রচার চালাচ্ছেন। পাক বেতার প্রত্যহই এই ছিন্নমূল, দুর্দশাগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ পরিবারের হাহাকার ভরা অভিযোগকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। আর এদের নিয়ে করছেন মর্মান্তিক রসিকতা।

ভারতে আসা শরণার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগ হিন্দু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ইউ পি আই সংবাদ সংস্থার এক খবরে বলা হয়েছে, আশী লাখ শরণার্থী'র মধ্যে কয়েক লাখ মুসলমান বাদে আর সবই হিন্দু। আমার মতে এই লাখ লাখ হিন্দুর মধ্যে কয়েক হাজার বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এবং উপজাতীয় অধিবাসীও রয়েছেন। বাংলাদেশে মুসলমানেরা বিপুলভাবে সংখ্যাগুরু তারপরই হিন্দুদের স্থান। ২৫শে মার্চের আগে বাংলাদেশে এক কোটি থেকে সওয়া কোটি হিন্দু ছিলেন। বর্তমানে দেশত্যাগী আশি লাখ শরণার্থী'র মধ্যে অন্তত সত্তর লাখ হচ্ছে হিন্দু, এই হিসাব অবিশ্বাস্য নয়। কেন নয় সেই কথা বলছি।

মে মাসের একুশ তারিখে বরিশাল থেকে এলিয়টগঞ্জ নামে একটা দোতলা লঞ্চে ঢাকা আসছিলাম। বরিশাল ও ঢাকার মধ্যে নদী পথে স্বাভাবিক যোগাযোগ তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ষ্টীমারের কোন পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী নেই। তার আগের দিন বরিশাল থেকে কিছু দূরে নদীর বাজারঘাটে গেরিলা বাহিনী, ষ্টীমারে হ্যাণ্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে ঢাকাগামী ষ্টীমারটি বরিশালে ফিরে আসে এবং দুদিন ধরে সার্ভিস বন্ধ থাকে।

আমি তাই লঞ্চে ঢাকা ফিরছিলাম। ষ্টীমারের ডেকে কজন লুঙ্গি পরা যাত্রীকে ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে বসে থাকতে দেখলাম। তাদের

সকলের গলাতেই ক্রস ঝুলছে। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম।

লোকটি ফিস্‌ফিস্ করে বললে, তারা সকলেই হলো বাঙালী খ্রীষ্টান। বরিশালের কাছেই শিবপুর গ্রামের এক খ্রীষ্টান মিশনারীর সঙ্গে তারা যুক্ত। পাক বাহিনী সেই গ্রামে ঢুকে তাদের হিন্দু ভেবে নির্বিচারে হত্যা করেছে। যারা বেঁচে আছে তারা গলায় ক্রস ঝুলিয়ে চলাফেরা করতে বাধ্য হয়।

তার কারণও আছে।

পাক বাহিনীর স্থানীয় কমাণ্ডার হুকুম দিয়েছেন, প্রত্যেকটি খ্রীষ্টানকে গলায় ক্রস ঝুলিয়ে পথে চলাফেরা করতে হবে। তা না হলে তাঁর সেনারা যদি কাউকে ভুল করে হিন্দু ভেবে হত্যা করে তা হলে তার কোনও কসুর হবে না।

এমন ঘটনা অবিশ্বাস্য সন্দেহ নেই।

গলায় ক্রস না ঝুলালে দেশী খ্রীষ্টানদের হিন্দু ভাবা হবে এবং দেশের একজন নাগরিক শুধুমাত্র ধর্মে হিন্দু এই অপরাধে তাকে হত্যা করা হবে। এমন ঘটনা চোখে না দেখলে কেবল কানে শুনে এযুগে বিশ্বাস করাও কঠিন।

ঢাকা পৌঁছে কানের নয়, চোখেরও বিবাদ ভঞ্জন হলো। প্রায় জনশূন্য ঢাকা নগরীর রাজপথে এমন কজন পথচারী চোখে পড়ল, যাদের গলায় ক্রস ঝুলানো। ঢাকার শহরতলীর কমলাপুরে বৌদ্ধ মঠ রয়েছে। সেখানকার এক ভিক্ষু গলায় কাগজ ঝুলিয়ে তাতে উর্দূ ভাষায় লিখেছেন, "আমি বৌদ্ধ—হিন্দু নই। দয়া করে আমাকে হত্যা করবেন না।

ঢাকার একটা বাংলা দৈনিকের ষ্টাফ ফটোগ্রাফার এই বৌদ্ধ ভিক্ষুর বিজ্ঞাপন সহ ছবি তুলেছিলেন। ফলে তিনি তাঁর ক্যামেরাটি হারিয়েছেন এবং শারীরিক নির্যাতিত হয়েছেন।

ঢাকার পাকিস্তান অবজারর্ভার পত্রিকার এপ্রিল ও মে মাসের ফাইল যদি কারো কাছে থাকে, তিনি যেন দয়া করে তার পাতা উল্‌টিয়ে দেখেন।

এই সময় নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞাপনের হিড়িকে ঢাকার দু'একটি কাগজের পাতা ভরে উঠেছিল।

পাকিস্তান অবজার্ভারে প্রকাশিত এমন একটি বিজ্ঞাপন, "আমার নাম অঞ্জলি দাস নয় এঞ্জেলিক ডায়াস এবং আমি হিন্দু নই, দেশী খ্রীষ্টান।"

কিন্তু এত করেও বহু শিক্ষিত বাঙালী খ্রীষ্টান পরিবার বাঁচেনি।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে অবস্থিত সেণ্ট জোসেফ গীর্জা এবং স্কুলের একজন শ্বেতাঙ্গ যাজক আমাকে জানান, তাঁদের স্কুলে বহু দেশী খ্রীষ্টান পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পাক বাহিনীর লোকেরা হানা দিয়ে একরাতে তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে ত্রিশজন সক্ষম যুবককে ধরে নিয়ে যায়। তাদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ধৃতদের মধ্যে সেণ্ট জোসেফ স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন।

২৫শে মার্চের পর প্রায় দেড় মাস পাক বাহিনীর মধ্যে একটা অন্ধ উত্তেজনা ছিল, বাঙালী পেলেই হত্যা করব। তারা হিন্দু মুসলমান যাই হোক।

এরপর তাদের মধ্যে—নতুন উন্মাদনা সঞ্চার হলো, কাফের হত্যা কর। আর কাফের বলতে অবশ্যই বাঙালী হিন্দুদের বোঝায়।

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী হত্যার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে কেবল হিন্দু নিধন যজ্ঞ পূর্বপরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত।

ইসলামাবাদের জঙ্গী-চক্র এটা জানেন সামরিক অভিযান চালিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী মুসলমানকে হত্যা করে বাংলাদেশ বাঙালী শূন্য করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এক কোটি বা সওয়া কোটি বাঙালী হিন্দুর বিরুদ্ধে হত্যাভিযান চালিয়ে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে নিধন করা সম্ভব এবং বাকী অংশকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে ভারতে ঠেলে দিয়ে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা সহজ।

২৫শে মার্চের সামরিক তৎপরতার দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্য তাই, বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য করা। জঙ্গী সরকারের পরামর্শদাতাদের ধারণা উদীয়মান বাঙালী মুসলমানের মেরুদণ্ড সরকারী কর্মচারী, ছাত্র সংস্থা, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ ও ব্যবসায়ী সমাজকে আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা গুঁড়িয়ে দিলে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করা হলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হবে এবং বাংলার মুসলমান চাষী ও কৃষক সমাজ পরবর্তী দশ বছরের জন্য (অর্থাৎ গুঁড়িয়ে যাওয়া বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ আবার শিরদাঁড়া সোজা না করা পর্যন্ত) ইসলামাবাদের রাজনৈতিক তাঁবেদারী মেনে নেবে।

বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্তের আরেকটি উদ্দেশ্য, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ভারতের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত করা। যাতে ইন্দিরা সরকার ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ ও অবকাশ না পান।

দ্বিতীয় হিন্দু উদ্বাস্তু ঠেলে দিয়ে ভারতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে ওখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি হয় এবং ইসলামাবাদ পরিস্থিতির পুরোপুরি সুযোগ নিয়ে আমাদের বর্বরতাকে ঢাকা দিতে পারে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে তার বিরোধকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কিত একটা সমস্যা হিসাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে বাংলাদেশের আসল রাজনৈতিক সমস্যা চাপা দিতে পারে।

কুচক্রীর চক্রান্তের নজীর বহুমুখী।

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য ইসলামাবাদের জঙ্গী-চক্র করেননি এমন কোনো কাজ নেই।

অধিকৃত বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তারা বাঙালী মুসলমানকে দিয়ে হিন্দু প্রতিবেশীর ঘর বাড়ি লুট করা এবং অগ্নিসংযোগের জন্য তিন ঘণ্টার সময় দিয়ে নোটিশ দিয়েছেন।

গ্রামের চোর-ডাকাতদের অপরাধ অনুষ্ঠানের ঢালাও সুযোগ ও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা শহরের সম্পন্ন ব্যবসায়ী এবং ভাসানীপন্থী ন্যাপের এককালের নেতা জনাব সাইদুল হাসান তাঁর ব্যবসায়ের হিন্দু পার্টনারকে স্বগৃহে আশ্রয় দিলেছিলেন এই অপরাধে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

আমার ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালেও জানা যায়নি সাইদুল হাসান বেঁচে আছেন কিনা।

ঢাকার জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাকের অফিস পাক বাহিনী অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করে।

দীর্ঘ ৫৬ দিন পর সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের গরজে যখন পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন, তখন পত্রিকার হিন্দু কর্মচারীদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে, তাদের নিরাপত্তা কোনোভাবে বিঘ্নিত হবে না।

এই আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে পত্রিকার প্রধান হিসাব-রক্ষক শ্রীঅনিল দাস আরো কয়েকজন হিন্দু কর্মচারী সহ আত্মপ্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে।

শ্রীদাস সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে দোতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দেন এবং মৃত্যুবরণ করেন।

কোথাও কোথাও দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমান প্রতিবেশী কখনও

সৈন্যদের ভয়ে, কখনো প্রলোভনে পড়ে, হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুট করেছে আগুন দিয়েছে।

স্থানে স্থানে সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা মুসলীম লীগ ও জামাতে ইসলামীর গুণ্ডাদের সঙ্গে মিশে রাজনৈতিক কভার নিয়ে হিন্দু পরিবারের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, তাদের যথাসর্বস্ব লুট করেছে।

এই ধরণের সমাজবিরোধী তৎপরতার পেছনে জঙ্গী-চক্রের প্রশ্রয় ও সমর্থনের আসল উদ্দেশ্য, দেশত্যাগী হিন্দুরা একটা মুসলীম বিরোধী মনোভাব নিয়ে ভারতে যাক এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেখানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিলে জঙ্গী-চক্রের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে।

জঙ্গী-চক্র নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার থেকে কিছুদিন আগে প্রচার করা হয়েছে, ভারতে যেসব শরণার্থী এসেছেন, তাদের মধ্যে মুসলমানেরা ভারত সরকারের কাছ থেকে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার এবং হিন্দুরা সমাদর পাচ্ছেন।

ভারতে আগত মুসলীম শরণার্থী মাত্রেই জানেন, এর চাইতে ডাহা মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না।

এই মিথ্যা প্রচারের আসল উদ্দেশ্য বাংলাদেশ এবং ভারত দু'দেশেই সাম্প্রদায়িক ভুল বোঝাবুঝি ও বিদ্বেষ জাগ্রত করা এবং ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্রের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা।

আগরতলার একজন দায়িত্বশীল ভারতীয় মুসলমান আমাকে বলেছেন – ইয়াহিয়া চান, ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধুক। ভারতে আমরা যে কয়েক কোটি মুসলমান রয়েছি, আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার কথায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন। অথচ মুখে ইয়াহিয়া বলে চলেছেন—ইসলাম ও মুসলমানের নিরাপত্তার জন্যই তাঁর সরকারের এত সব কাণ্ডকীর্তি। তিনি যে কত বড় ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

জিন্না সাহেবের পর লিয়াকৎ আলী এবং লিয়াকৎ আলীর তিরোধানের দীর্ঘদিন পরে ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব করায়ত্ব করেন। আয়ুব ও ইয়াহিয়া আসলে ভুট্টোর ক্রীড়ানক বলা চলে।

যদিও ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এই শ্লোগানের ঠিক আড়ালেই এই তিন নেতার রাজনীতি, তবুও এদের একজনও পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু বাঙালী মুসলমানদের কখনো বিশ্বাস করেননি। স্বাধীনতা পূর্ব যুগ থেকে স্বাধীনতার পরের যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জিন্না-ফজলুল হক বিরোধ, লিয়াকৎ-সুরাবর্দী বিরোধ এবং সবার শেষ পর্যায়ে ভুট্টো-মুজিব বিরোধ একই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে।

জিন্না সাহেব ফজলুল হককে 'কংগ্রেস ও শ্যামাপ্রসাদের ক্রীড়নক' আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালের স্বাধীনতা দিবসে করাচীর জাহাঙ্গীর পার্কের সভায় দাঁড়িয়ে লিয়াকৎ আলী বলেছিলেন 'সুরাবর্দী ভারতের লেলিয়ে দেওয়া কুত্তা।' এরপর বাংলাদেশের অবিসংবাদী জাতীয় নেতা শেখ মুজিবর পর্যায়ক্রমে আইয়ুব, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর দ্বারা যে 'ভারতের এজেণ্ট ও দেশদ্রোহী' হিসাবে চিত্রিত হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

এইসব ঘটনাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় লক্ষ্য অভিন্ন নয়। ফলে এই দুই অঞ্চলের জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যেও কখনো প্রকৃত বোঝাবুঝি বা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধর্মীয় জাতীয়তায় অবাস্তব ভিত্তির ওপর এই সমঝোতা কখনো সম্ভব হয় না। জিন্না তা জানতেন। তাই তিনি বাংলাদেশের মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ঘোরাবার জন্যে বাংলাভাষাকে হত্যায় উদ্যত হয়েছিলেন।

যাঁরা তাঁর এই ভাষা নিধন কাজে বাধা দিতে চেয়েছিলেন তাঁদের

তিনি 'ভারত ও হিন্দুর এজেন্ট' বলে জেলে পুরতে বা হত্যা করতে চেয়েছিলেন। লিয়াকৎ আলীর অগণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক ফরমূলার বিরুদ্ধে যখন সারা বাংলা দেশ চীৎকার করে উঠেছে তখন ভারতের বিরুদ্ধে বদ্ধমুঠি তুলে ভারত বিদ্বেষের বন্যা ছুটিয়ে তিনি বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন দমাতে চেয়েছেন। জিন্না ও লিয়াকৎ আলীর আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দু পণ্ডিত ও হিন্দু শিক্ষাবিদদের বিতাড়ন করা হয়। উচ্চ সরকারী পদে হিন্দু নিয়োগ বন্ধ করা হয়, হিন্দুদের সব ব্যবসা বাণিজ্য গুটাতে বাধ্য করা হয়।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধের পর অসংখ্য হিন্দু নাগরিকের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তির ওপর শত্রুসম্পত্তি ছাপ মেরে তা জবরদখল করা হয়। চিন্তায় ও কর্মে বামপন্থী এমন বহু হিন্দু রাজনৈতিক নেতা দেশত্যাগে সম্মত না হওয়ায় বছরের পর বছর জেলে কাটিয়েছেন—বরিশালের সতীন সেনের মত কয়েকজন হিন্দু নেতা লোকচক্ষুর আড়ালে জেলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখনই কোন রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে, তার প্রথম বলি হয়েছেন হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা।

অনেকে বৃদ্ধ বয়সে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের রোষ ও নির্যাতন থেকে বাঁচতে পারেনি।

বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে গোয়েন্দা বিভাগ হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবিদের একটা তালিকা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

ঢাকায় কোন আন্দোলন শুরু হলে—তা ভাষা আন্দোলন হোক আর শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন হোক, প্রথমেই হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবিদের আটক করা হতো।

সরকারী প্রচারপত্র এবং সরকার সমর্থক সংবাদপত্রে প্রচার চালানো

হতো, ধৃত মুসলমান নেতারা ভারতের যোগসাজসে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা এঁটেছিলেন।

এই উগ্র ভারত বিরোধী সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু বিরোধী অসুস্থ রাজনীতির গোড়াপত্তন করে যান জিন্না সাহেব নিজে।

তিনি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে ভারত ও হিন্দুর চক্রান্ত আখ্যা দেন। তিনি আশা করতেন যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তার ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তি পাকিস্তান তাকে জিইয়ে রাখতে পারলে বাঙালী, সিন্ধী, পাঠান, বালুচী প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতীয়তাগুলোর স্বাতন্ত্র মেনে নিতে হবে না এবং বাংলাদেশকে রাষ্ট্রক্ষমতায় সংখ্যাগুরুর অধিকার নিয়ে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা যাবে।

জিন্না যেমন পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙালীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করতে চাননি, তেমনি চাননি লিয়াকৎ আলি, মমতাজ দৌলতানা চৌধুরী মহম্মদ আলি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ভুট্টোও এই একই নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল সমস্যা ওখানেই।

জিন্না থেকে শুরু করে ভুট্টো ইয়াহিয়া খাঁ সবাই চেয়েছেন, পাকিস্তানে এমন একটি শাসনতন্ত্র তৈরী হোক, যে শাসনতন্ত্রে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা উপেক্ষিত হবে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা কার্যতঃ তাঁদের হাতে থাকবে।

এই ইচ্ছা থেকেই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে সংখ্যা সাম্যের অগণতান্ত্রিক বিধান যুক্ত করা হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে কার্যতঃ বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান পরিষদ সদস্যদের জাতীয় পরিষদে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করা হয়।

কিন্তু বাংলাদেশে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে প্রবল আন্দোলন হওয়ায় পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

হিন্দু নেতাদের উপর এই চক্রের আরও ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুর সর্বপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও হিন্দু নেতারা পৃথক নির্বাচনের ফাঁদে পা দিতে রাজী হয়নি। বরং তাঁরা একবাক্যে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

এই সময় পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সমর্থক সংবাদপত্রে এই মর্মেও প্রচার চালানো হয়েছিল যে, যুক্ত নির্বাচন হচ্ছে যুক্ত বঙ্গ গঠনের পুরোনো ভারতীয় চক্রান্তের অংশ।

১৯৬২ সালের আইয়ুবী শাসনতন্ত্রে জনগণের ভোটাধিকার হরণেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল, বাংলাদেশকে রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষমতায় ন্যায্য অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রক্ষমতার প্রাপ্য অংশ পেলে উপনিবেশ ও একচেটিয়া বাজার হিসাবে একে আর ব্যবহার করা যাবে না, এবং পাকিস্তানের অস্বাভাবিক সামরিক বাজেটের সিংহ ভাগ পশ্চিম পাঞ্জাবের মিলিটারী আমলাদের কবজায় থাকবে না। এই ভয় থেকেই গত তেইশ বছরের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত রাখার বহু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনোটাই সফল হয়নি।

তাই এবার চূড়ান্ত ও শেষ চেষ্টা বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করা।

বাংলাদেশে যত গণহত্যাই চালানো হোক তাতে সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমানকে একেবারে খতম করা সম্ভব নয়।

কিন্তু সওয়া কোটি হিন্দুর একটা বড় অংশকে খতম করা সম্ভব এবং বাকি অংশকে ভারতে ঠেলে দিয়ে পাকিস্তানে বাঙালীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা খতম করা সহজ।

আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সওয়া কোটির মতই বেশী।

সুতরাং এই সওয়া কোটি হিন্দুকে দেশ ছাড়া করতে পারলে এবং সেই সঙ্গে আরও অর্ধকোটি বাঙালী মুসলমান দুষ্কৃতকারী ও দেশদ্রোহী হিসাবে পাক বাহিনীর সামরিক তৎপরতায় নিহত ও দেশত্যাগী হলে বাংলাদেশ কার্যতঃ পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশে পরিণত হবে এবং তখন বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে পিণ্ডির শাসকদের আর ভাবতে হবে না।

সম্ভবতঃ এই চিন্তা ভাবনা থেকেই পাকিস্তানে বছরখানেক পরে লোক গণনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং লাহোরে একটি উর্দু দৈনিক ইতিমধ্যেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দাবী করেছেন বাংলাদেশে লোক গণনা করা হলে দেখা যাবে পাকিস্তানে বাঙালীর সংখ্যানুপাতিক অংশ শতকরা ৩৫ ভাগও নয়।

* * *

জিন্নার যুগে পাকিস্তানে যে হিন্দু বিতাড়ন নীতির সূচনা, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর যুগে তারই নিধন ও উৎসাদন নীতিতে পরিণতি লাভ।

দেশ বিভাগের আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব ছিল প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের হাতে।

নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের সঙ্গে ওই নিয়ে তার কিছুটা রেষারেষি ও বিরোধ ছিল।

এই বিরোধকেই বিদ্বেষে পরিণত করে জিন্না তার ধর্মীয় দ্বিজাতি তত্ত্বকে কাজে লাগান।

কিন্তু দেশ ভাগের পর হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী সরকারী নীতির দরুণ দ্রুত দেশত্যাগ করার পর বাঙালী মুসলীম মধ্যবিত্ত দেখতে পান চাকরি-বাকরি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সেনাবাহিনী বা বৈদেশিক দপ্তর কোথাও তাদের ইপ্সিত প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেনি। বরং হিন্দু মধ্যবিত্তের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে অবাঙালী মুসলমানেরা।

ফলে তাদের রাজনৈতিক অধিকারও খর্ব হতে চলেছে।

অতি দ্রুত তারা বুঝতে পারেন, তাঁদের আসল মূল শত্রু কারা?

ফলে ১৯৫৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং মুসলিম লীগ জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৯৫০ সালে এবং ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে দুটি বড় রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর একটিতেও বাঙালী মুসলমানের উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল না। দুটি দাঙ্গাতেই ছিল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা।

১৯৫০ সালের দাঙ্গায় মুসলিম লীগের নেতা দাঙ্গা সৃষ্টিতে প্রকাশ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৬৪ সালে ঢাকার কোন কোন অবাঙালী মিল মালিক তাদের শ্রমিকদের পুরো দিনের সবেতন ছুটি, অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে দাঙ্গায় অংশ গ্রহণে প্ররোচনা ও উৎসাহ দিয়েছিল।

১৯৫০ সালে বাঙালী মুসলমানেরা দাঙ্গা প্রতিরোধ করেননি, বরং তাদের একটি অংশ পুরোণো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে এই দাঙ্গায় অংশ করেছিল।

কিন্তু ১৯৬৪ সালে বাঙালী মুসলমান সর্বশক্তি দিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছে এবং দাঙ্গা বাধানোর সরকারী নীতি ব্যর্থ করে দিয়েছে।

এই অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানসহ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও পীড়ন নীতি গ্রহণে তৎকালীন আইয়ুব সরকার দ্বিধা করেননি।

১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু বিতাড়ন।

পাকিস্তানের শাসকচক্র আশা করেছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্তের

দেশত্যাগের ফলে বাংলাদেশ রাজনৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা হারাবে এবং তার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দ্রুত অবাঙালী মুসলমানদের হাতে চলে আসবে।

এজন্যে পাকিস্তানের বাজেট তৈরী, শিল্প ও বাণিজ্য নীতিতে এমন পন্থা অনুসরণ শুরু করা হয় যাতে বাঙালী মুসলমানদের পুঁজি গঠন ও পুঁজি সঞ্চয় হতে না পারে।

এত সত্বেও ষাট দশকের গোড়ার দিকে দেখা গেল বাংলাদেশে সামাজিক কাঠামোর অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসাবে হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ রয়ে গেছে—যে অংশের বিনাশ অথবা সম্পূর্ণ উৎসাদন ছাড়া বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিরোধের অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করা সম্ভব নয়।

হিন্দু সমাজের এই বড় অংশ হলো, জেলে, কুমোর, তাঁতি, কলুই, ভুঁইমালি, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু।

বাঙালী মুসলমানেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবি। এসব পেশায় তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল না। বরং তারা হিন্দু জেলে, তাঁতী কুমোর, ধোপা, নাপিতের উপর সামাজিকভাবে নির্ভরশীল।

এই সামাজিক নির্ভরতা থেকে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এতদিনকার বৈরিতার বদলে মিত্রতায় সখ্যতায় নতুনভাবে রূপান্তরিত হতে শুরু করে।

ইসলামাবাদের শাসকচক্র তাতে ভয় পেলেন। তারই ফল ১৯৬৫ সালের দাঙ্গা।

এই দাঙ্গার পরই দেখা গেল ঢাকার বাজারে আগের মত মাছ উঠছে না।

সরকারী প্রচারপত্রে বলা হলো ভারতে মাছ পাচারকারী চোরা-চালানীদের শায়েস্তা করা হয়েছে।

দাঙ্গার পর আরো দেখা গেল, ঢাকা ও অন্যান্য সহরগুলো প্রায় হিন্দু ধোপা নাপিত শূন্য হয়ে গেছে।

যেখানে সেখানে অবাঙালী মুসলমান পরিচালিত চুল কাটার সেলুন ও কাপড় ধোয়ার লণ্ড্রীর সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশের বাজারে সরষের তেল বরাবরই মাগ্‌গি, সময় সময় দুষ্প্রাপ্য। ঘিয়ের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

ঢাকার বিখ্যাত কাপড় কাচা সাবান, আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল, নারিকেল তেল, বাজারে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। তার বদলে করাচী ও লাহোরে তৈরী নিম্নমানের তেল সাবান ও প্রসাধনী দ্রব্য বাংলাদেশের বাজার ছেয়ে গেছে।

* * * *

বাংলাদেশে ধর্মীয় দ্বিজাতীতত্ত্ব ব্যর্থ হয়েছে। তারই সংহার মূর্তি আজ সেখানে প্রকট।

হিন্দু নিধন ও বিতাড়ন দ্বারা এই ব্যর্থ ও প্রত্যাখ্যাত তত্ত্বেরই ছিন্নমূল আবার বাংলাদেশের মাটিতে রোপণের অপচেষ্টা হচ্ছে।

বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হলে এবং বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের বর্তমান রাজনৈতিক প্রতিরোধ চূর্ণ করা গেলে বাংলাদেশে শুধু বাঙালীত্ব বর্জিত মুসলমান বাস করবে এবং তারা হবে ইসলামাবাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল এমন একটা দুরাশা ইয়াহিয়া সরকার এখনও মনে পোষণ করছেন।

বাঙালী মুসলমানের অগ্রসর অংশকে নিপাত করে যদি অবশিষ্ট অংশের বাঙালীত্ব হরণ করা যায়, তাহলে বাংলাদেশে ইসলামাবাদের ষোড়শ শতকী উপনিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হবে, এটা তাদের বিশ্বাস।

কয়েক লাখ জাতীয়তাবাদী মুসলমান বাঙালীকে হত্যা, হিন্দু নিধন ও উৎসাদনের পর বাংলাদেশে উর্দু ভাষা ও পশ্চিম পাকিস্তানী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া যাবে বলে তারা বিশ্বাস করেন।

এরই মধ্যে কিছু সংখ্যক অনুগৃহীত বাঙালীর সহায়তায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তথাকথিত ইসলামীকরণের নীতি চালু করা হয়েছে।

বেতারে রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ হয়েছে, বাংলা ছবি প্রদর্শন বন্ধ হয়েছে, দোকানের সাইনবোর্ড ও গাড়ির নম্বর বাংলায় লেখা বর্জিত হয়েছে এবং শহরাঞ্চলে স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাটের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের কাছে বিখ্যাত রেলষ্টেশন ধুমের নামকরণ ইতিপূর্বেই করা হয়েছিল। চীনা কী আস্তানা। এখন নারায়ণগঞ্জ বন্দরের নাম ফিরিজাবাগ রাখার তোড়জোড় হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে।

এইভাবে বাঙালীত্ব বর্জিত বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমান ধর্ম রক্ষার অজুহাতের আড়ালে ইসলামাবাদের শাসকচক্র একটি নিকৃষ্ট ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়।

আর এই উপনিবেশ রক্ষার জন্যই তারা গত ২৬শে মার্চের পর ইসলাম রক্ষার নামে কয়েক লাখ বাঙালী মুসলমানকে হত্যা করেছেন এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ হিন্দুশূন্য করার পরিকল্পনা এঁটে বাংলাদেশ ও ভারত এই তু'দেশেই সাম্প্রদায়িকতার দাসকে আবার জীবন্ত করে তুলতে চান।

কোটি কোটি মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে স্থায়ী করা। তাই তারা যত কিছু নীচ কাজ হোক না কেন নির্বিবাদে তা করতে পারে— যা করতে পারে না অন্য কোনও মনুষ্যত্ব সম্পন্ন দেশ, জাতি বা সরকার।

১৪

সব ওলট পালট করে দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নিকসন। তাঁর সম্ভাব্য পিকিং সফরের ঘোষণা জোর ধাক্কা দিয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর।

বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন নয়াদিল্লী। প্রয়োজন পড়েছে পররাষ্ট্র নীতি ঢেলে সাজাবার।

ইয়াহিয়ার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত চাঙ্গা করে তোলবার বিরামহীন অভিযান এখন স্তিমিত।

দুনিয়ার সামনে এতদিন ছিল না কোন নূতন করে গজান আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশ পেয়েছিল প্রাধান্য।

এখন নিকসন চৌ এন লাই নিয়ে গবেষণা চলবে সর্বত্র। বাংলাদেশ স্থান পাবে পেছনের সারিতে।

ভারতের কাছে এ সমস্যা জীবন মরণের সমস্যা। মাত্র ক'দিন আগে মার্কিণ পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি সুপারিশ করেছিলেন পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধের জন্য।

তাঁরা বলেছিলেন বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ সাহায্য পাঠান উচিত হবে না।

বিশ্বব্যাঙ্কের মূল্যায়ণ এবং মার্কিণ পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সুপারিশ আশা জাগিয়েছিল ভারতের মনে।

নয়াদিল্লী ভেবেছিলেন মার্কিণ কর্তাদের ওপর পড়েছে জনমতের চাপ। তাঁদের নতি স্বীকার আসন্ন। এ আশা এখন ভেস্তে যাবার উপক্রম।

ইয়াহিয়া খান দাঁড়িয়ে আছেন আসামীর কাঠবড়ায়। তাঁর পক্ষের উকিল চীন। এই চীনের সঙ্গেই ঘটতে যাচ্ছে মার্কিণ মিতালী। এর ব্যাপকতা কতখানি এখন তার পরিমাণ করা মুস্কিল।

তবে একথা সত্য চীন মার্কিণ রাখীবন্ধনে দূতীয়ালী করেছে পাকিস্তান। তাকে চটাবে না আমেরিকা। পাকিস্তান চটলে চটবে চীন। তাতে বিঘ্নিত হবে নিকসনের শান্তি অভিযান। মনে হয় ইয়াহিয়ার নরমেধযজ্ঞে পড়বে মার্কিণ সম্মতির প্রকাশ্য ছাপ।

তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের সংগ্রাম। ভারতের ভাগ্যে জুটবে আরও বিড়ম্বনা। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী নিয়ে সে পড়বে অথৈ জলে।

নয়াদিল্লী যদি সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখাতে পারেন তবে হয়ত ফাঁড়া কাটবে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে কোনদিনই সমর্থন করেননি মার্কিণ শাসকগোষ্ঠী। ওরা আগাগোড়াই সাহায্য দিয়েছেন ইসলামাবাদের জঙ্গীশাহীকে।

সব সময়ই চীন আড়াল করেছে ইয়াহিয়া খানকে। পৃথকভাবে এরা দুজনেই পাকিস্তানের প্রাণের দোস্ত।

এতদিন তারা পৃথকভাবে দাঁড়িয়েছিল ইসলামাবাদের পাশে। এখন হয়ত স্থান নেবে একত্রে।

যদি সম্ভাব্য চীন মার্কিণ সমঝোতার প্রকৃতি কূটনৈতিক গণ্ডীর বাইরে না যায় তবে ভারতের ভাবনা নেই কিছু।

কিন্তু এটা যদি হয় প্রভাবক্ষেত্র বিলি বণ্টনের পূর্বাভাষ তবে প্রয়োজন পড়বে নতুন চিন্তার। পশ্চিম এশিয়া কিছুতেই ছাড়বে না আমেরিকা।

পূর্ব-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নিয়ে চলবে টানাহেঁচড়া।

মার্কিণ কর্তৃপক্ষ এ অঞ্চল চীনের হাতে ছেড়ে দেবেন কিনা বলা মুস্কিল।

গোপনে যদি এ ধরণের একটা ব্যবস্থা হয়ে থাকে তবে প্রয়োজন পড়বে নয়াদিল্লীর সামরিক ষ্ট্রাট্রেজীর পরিবর্তন।

কারণ ভারতের বিরুদ্ধে চীনা হুমকি পাল্টা হিসাবে আসবে না আসবে তখন চিরাচরিত মার্কিণ হুমকি।

ফলে পাকিস্তান হবে আরও তুর্বিনীত। এ ধরণের গবেষণা খুবই কষ্টসাধ্য। রাতারাতি আমেরিকা করতে পারে না তার পররাষ্ট্র নীতির আমূল পরিবর্তন।

সোভিয়েট রাশিয়াকে কোণঠাসা করার জন্য যতটুকু দরকার তার বাইরে সে হয়ত হাত দেবে না।

আমেরিকার কাঁধে ভর দিয়ে জাতে উঠতে চাচ্ছে চীন। সফল হলে ভারত এবং সোভিয়েট রাশিয়া সমভাবেই হবে কোণঠাসা।

বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে মস্কো হয়ত দেখাবেন বেশী আগ্রহ। পরিবর্তিত অবস্থার সুযোগ নিতে হবে ভারতকে।

সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই বাংলাদেশ সরকারের সামনে।

নয়াদিল্লীর পদে পদে বিড়ম্বনা। একটা একটা করে তাদের ঘর তাঁরা তৈরী করেছেন। পরমুহূর্তেই সেগুলো ভেঙ্গে পড়ছে।

মুজিবর-ইয়াহিয়ার বোঝাপড়ার সম্ভবনা উবে গেছে। সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন ইয়াহিয়া খান। এখন নাকি তিনি করবেন মুজিবরের বিচার।

গণহত্যাকারী বর্বর ঘাতক সাজতে চাচ্ছেন জন প্রতিনিধিদের বিচারক। গত মাসের আপ্রাণ চেষ্টার পর বিশ্ব জনমত কিছুটা জাগিয়ে তুলেছিলেন নয়াদিল্লী।

মার্কিণ মুলুকেও লেগেছিল তার ঢেউ। প্রেসিডেন্ট নিকসনের সাম্প্রতিক ঘোষণায় তাও চাপা পড়বে।

সবাই মেতে উঠবেন সম্ভাব্য চীন মার্কিণ সম্পর্কের তাৎপর্য

ব্যাখ্যায়। উপেক্ষিত হবেন নির্যাতিত বাংলাদেশের নিরীহ মানুষগুলো। ভারতের মাথা থেকে নামবে না শরণার্থীর বোঝা। নয়াদিল্লীকে বাছতে হবে নিজের পথ। অবস্থা আগের চেয়েও বেশি ঘোরাল। প্রাথমিক সুযোগ নষ্ট করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার।

বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার সক্রিয় সমর্থনে তাঁরা যদি আগেভাগেই এগিয়ে আসতেন তবে এড়াতে পারতেন বর্তমান উপসর্গগুলো।

হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার সময় নেই। সোভিয়েট রাশিয়ার মতামত নতুন করে বাজিয়ে দেখা দরকার।

প্রেসিডেন্ট নিকসনের ঘোষণার পর অবশ্যই শুরু হয়েছে সেখানে আত্মসমীক্ষা। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের পথ নিঃসন্দেহে ভারতের পথ।

স্বাধীন বাংলাদেশের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ছাড়া শরণার্থীরা ফিরতে পারবেন না স্বদেশে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তন ঘটলেও পরিবর্তন ঘটবে না এই মহা-সত্যের। বাংলাদেশ সমস্যার আশু সমাধান না হলে মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যেই হয়ত দেখা দেবে ক্ষমতার লড়াই।

ইয়াহিয়ার ঘাতক বাহিনী যখন ব্যস্ত থাকবে ধ্বংসলীলা এবং প্রশাসনিক সংহতি প্রতিষ্ঠার কাজে তখন মুক্তাঞ্চলে হয়ত দানা বাঁধবে দলীয় রাজনীতির প্রাধান্যের প্রতিযোগিতা।

বাংলাদেশে হয়ত ঘটবে স্পেনের গৃহযুদ্ধের শেষ দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। সতর্ক হোন নয়াদিল্লী। দ্রুত বদলাচ্ছে দুনিয়ার হালচাল।

সংক্ষেপ করুন দ্বিতীয় চিন্তার সময়। বাংলাদেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিন এখনই। দেরী হলে আরও বাড়বে সমস্যার জটিলতা। পঙ্গু হয়ে পড়বেন কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলাদেশের সঙ্গে মহাতিমিরে ডুববে ভারত।

১৫

বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ ও গেরিলা বাহিনী আজ যে সর্ব রণাঙ্গণে জয়লাভ করছে এবং পাকিস্তানী খান সেনাদের ও তাদের সমর্থক মীরজাফরদের অবস্থা কাহিল তা আজ ভারতের প্রতিটি সংবাদপত্রে আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

জনগণের এই যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে তাদের মধ্যে ছিল না কোনও যোগাযোগ, কোনও সংহতি—তাদের না ছিল অস্ত্র, না ছিল আক্রমণের কৌশল।

তার উপরে খান সেনারা ত্রাস বা টেরর সৃষ্টির জন্য নারকীয় অত্যাচারের চূড়ান্ত চালিয়ে গেছিল। তার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক হয় নিহত, গৃহহারা। হাজার হাজার নারী হয় নির্মমভাবে ধর্ষিতা। এমনকি পাইকারীহারে নারীদের ধরে এনে পৃথক নারী নির্যাতন শিবির খুলেছিল পাক সেনারা। সে বর্বরতার কথা চিন্তা করলেও ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চিত হয়।

তবু মুক্তিফৌজ—ই. পি. আর, পুলিশ, বাঙালী রেজিমেন্ট প্রভৃতিরা জেনারেল ওসমানির নেতৃত্বে নানা রণাঙ্গণে বীরের মত যুদ্ধ করেছেন। অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন—তবে ধ্বংস করেছেন প্রচুর পাক সৈন্য। পাক অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ দিয়েছেন তেমনি ধ্বংসও করেছেন হাজার হাজার পাক সৈন্য। বাঙালী মেয়েরা পর্যন্ত যুদ্ধে নেমেছেন। ঢাকার ছাত্রী রোশনারা প্রাণ দিয়েছেন স্বেচ্ছায়।

তবু এই সংগ্রামে বীরত্ব ও দেশাত্মবোধ থাকলেও ছিল না সংহতি।

কিন্তু আজ যে লড়াই শুরু হয়েছে তার আগে মুক্তিযোদ্ধারা সকলেই দ্রুত শিক্ষিত—শিক্ষিত ও কৌশলী গেরিলা বাহিনী। তাই এবারের দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ অর্থাৎ হেরে পশ্চাদপসরণের পর এই নতুন আক্রমণে পাক সেনারা ভীত ও শশব্যস্ত। তা ছাড়াও তাদের দাপট ও অস্ত্রবল অনেক কম। মাসের পর মাস যুদ্ধে তারা ক্লান্ত। সেই রসদ উপযুক্ত পরিমাণে ও সবদিক দিয়েই তাদের অবস্থা ভয়াবহ।

ইতিমধ্যে গেরিলার কার্যকলাপ যা ঘটছে, তার কিছু কিছু খবর আসছে এদেশে ভেসে। একজন নৌকার মাঝি পাক সেনারা সাঁতার জানে না জানতে পেরে তাদের মাঝ নদীতে এনে নৌকা ডুবিয়ে দেয়। সে আর তার ছেলে সাঁতরে পালায়—কিন্তু কয়েকজন পাক সেনা খতম হয়।

একবার এক গ্রামে পাক সেনারা যায় খাদ্য অন্বেষণে। কোনও ঘরে খাদ্য নেই। গ্রামের সব লোক আগেই প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। একটি বাড়িতে ছিল ২।৩ জন বাঙালী মুসলমান। তারা বললে, যে তারা মুসলিম লীগের লোক।

তাদের কাছে ছিল চাল, ডাল, আলু। তারা বললে খান সেনারা খেলে তারা খিঁচুড়ি ও আলুসিদ্ধ রান্না করে দিতে পারে। খান সেনারা খুশী হলো। তারা মদ্য পান করে দশবারো জন খেতে বসল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিন্তু তারা কেউ আর উঠতে পারল না। ঐ খাদ্যে বিষ মেশানো ছিল। ঐ মুসলমান তিনজন আসলে গেরিলা।

আর একবার এক বুড়ি এলো ৮।১০টি ছাগল নিয়ে খান সেনাদের সামনে। বুড়ি বললে যে সে দুধ বিক্রি করে। খান সেনারা দুধ কিনলো তার কাছে। কিন্তু সেই দুধে ছিল বিষ—যারা খেলো সকলেই মারা গেল।

এইভাবে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই নানা কৌশলে নেমে পড়েছে

গেরিলা যুদ্ধে। খান সেনারা চিনতেই পারছে না—কে শত্রু আর কে মিত্র।

একবার চারটি মেয়েকে পুকুরের ধারে ঘুরে বেড়াতে দেখে কয়েকজন খানসেনা এলো গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে। এই মেয়েরাই গ্রেনেড মেরে তাদের শেষ করল।

তাই এ যুদ্ধ যে পথে চলেছে—মুক্তিযোদ্ধারা আরও যে পরিমাণে তৈরী হচ্ছে, তাতে খান সেনার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই।

* * *

ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া শেষ এক অস্ত্র ছেড়েছেন। তিনি বলেছেন যে শেখ মুজিবরের বিচার হবে। এই বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। এই বিচারে কোনও বিদেশী উকিল থাকতে পারবে না। একজন দেশী উকিল মুজিব দিতে পারেন। বিচার হবে গোপনভাবে। বাইরের কেউ তা জানতে পারবে না। জনসাধারণের সামনে মুজিবকে আনতে তিনি ভয় পান—তাই এই ব্যবস্থা করেছেন তিনি।

কিন্তু তাঁর হুংকারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার। বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র জনাব শাহাবুদ্দিনের বক্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

শাহাবুদ্দিনের এই বক্তব্য হলো ইয়াহিয়া খাঁর বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ।

২০শে জুলাই ১৯৭১। বাংলাদেশের প্রতিনিধি শ্রী কে, এম শাহাবুদ্দিন আজ এক বিবৃতিতে অবিসংবাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিচার ও তাঁকে চরম দণ্ডদানের চেষ্টার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারকে চরম সতর্ক করে দেন।

তিনি বলেন, যদি তাই হয়, তবে জেনারেল ইয়াহিয়া যেন মনে

রাখেন, বাংলাদেশ তাঁকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। এখন আমাদের জবাব হবে—"রক্তের বদলে রক্ত, প্রাণের বদলে প্রাণ"।

ভারতের বিরুদ্ধে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করবেন বলে যে হুমকি দেখাচ্ছেন, সে সম্পর্কেও পাক সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে শ্রীশাহাবুদ্দিন বলেন—এই যুদ্ধ যদি বাধে, তবে পাকিস্তান একেবারে খতম হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত হস্তক্ষেপ করেননি। একা বাংলাদেশের মানুষই ইয়াহিয়ার সৈন্যদের ঠাণ্ডা করে আনছে।

তিনি বলেন—ইয়াহিয়ার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকিতে বাংলাদেশের মানুষ অবাক হয়নি।

বাংলাদেশে পদে পদে মার খেয়ে ইয়াহিয়ার একথা বলা ছাড়া আর উপায় নেই। তাছাড়া বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতকে জড়িয়ে ফেলে নিজের কোলে বিশ্ব জনমত টানবার যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন তাও ভেস্তে গেছে।

কাজেই যুদ্ধের বুলি আওড়ান ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু ইয়াহিয়া খান নির্বোধ বলেই তাঁর সামরিক ক্ষমতার যে পরিমাণ তিনি করেছেন, তা অলীক। তা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখানো মাত্র।

তিনি তাঁর লুণ্ঠনকারী দলকে বাংলাদেশের ওপর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করেছে, ঐই লুণ্ঠনকারীরা দুর্বল। সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে ইয়াহিয়ার হিসেব ঠিক নয়।

এ সত্ত্বেও তিনি যে ভারতকে হুমকি দিচ্ছেন, তাতে তাঁর নির্বুদ্ধিতাই প্রমাণ করেছে।

যদি যুদ্ধ হয় তবে পাকিস্তানী স্বৈরতন্ত্র খতম হবে শুধু নয়, সারা পশ্চিম পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইয়াহিয়া বলেছেন, যুদ্ধের সময় পাকিস্তান একা থাকবে না। কিন্তু তাঁর এ হিসেবেও ভুল।

যদি তাঁর এখনও কিঞ্চিৎ বিদ্যাবুদ্ধি অবশিষ্ট থাকে তবে তাঁর বোঝা উচিত যে আজ কোন দেশই এই নখদন্তহীন দেউলিয়া দলকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না।

* * *

শ্রীশাহাবুদ্দিন এই বিবৃতিতে আরও বলেন, তাঁর (ইয়াহিয়া) এটা জানা উচিত যে, বাংলাদেশের শোষিত মানুষই আজ পাকিস্তানের বর্বর সৈন্যদলের সঙ্গে লড়াই করছে।

ভারত যদি বাংলাদেশের হয়ে সাহায্যে নামত, তবে বহু আগেই তিনি খতম হয়ে যেতেন। কারণ অতীত ইতিহাস সম্ভবতঃ পাক নেতারা ভুলে যাননি।

এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, ইতিহাস থেকে ইয়াহিয়া খান কোন শিক্ষা পাননি। কাজেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলার আগে তিনি যেন পাকিস্তানের ইতিহাসের পাতাগুলো একটু উল্টে দেখে নেন।

১৯৬৫ সালের পরাজয়ের গ্লানির কথা তাঁর ভুলে যাওয়া উচিত নয়। নিজের স্বার্থেই কথাটা মনে রাখা ভাল।

তিনি বলেন—বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, সাফল্যের সঙ্গে আমরা লড়ে যাচ্ছি। সারা বিশ্ব একথা জানে।

তাঁর এই পরাজয়ের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা এবং ভারতকে জড়িয়ে বিশ্বমত দলে টানার চেষ্টা সফল হবে না।

এখন সামরিক আদালতে শেখ মুজিবরের বিচারের কথা বলাটা ইয়াহিয়া সাহেবের বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

যদি আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায় বিচার সম্পর্কে তাঁর আস্থা থাকে

তবে তাঁর নিজেরই এই বিচারের সম্মুখীন হওয়া উচিত। কারণ তাঁর বাহিনীর দ্বারাই গণহত্যা, লুণ্ঠন ও নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার ঘটেছে।

আমি নিশ্চিন্ত, এই অপরাধে তাঁর ফাঁসি হওয়া উচিত। তা না হয়ে তিনিই আজ মুজিবরের বিচারের কথা বলছেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁ জানেন না বাংলাদেশের মানুষের গভীর দেশপ্রেমের কথা—জানেন না তাদের অন্তর্নিহিত বিরাট আগুনের কথা। আজ প্রতিটি লোকের মনে শুধু একটি মাত্র কথা—প্রতিটি বাঙালীর মনের কথা হলো :

বিশ্বের সকল নদী যদি রক্তনদী হয়,
তবুও বলবো মোরা, জয় বাংলা জয়।
সকল শ্যামল যদি রক্তিমাভ হয়,
তথাপি মোদের বাণী জয় বাংলা জয়।
যে শিশুটি জন্ম নিলো গভীর অন্ধকারে,
আমরা রক্তের মাঝে রক্ষা করি তারে।
মাতৃরক্তে স্নান করে সেই শিশু জাগ্রত নির্ভীক
ধ্বনিয়া তুলিছে সে যে দিক্ আর বিদিক্,
একটিমাত্র কান্না তার, একটিমাত্র বাণীটি অভয়,
জাগ্রত বাঙালী আজ, ফুকারিছে জয় বাংলা জয়।
বিশ্বের বিবেক আজ স্তব্ধ হোক, তবু নাই ভয়,
আমাদের শাশ্বত বাণী 'জয় বাংলা জয়'।”

১৬

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে নবতম এক অধ্যায় সূচিত হলো। দীর্ঘদিন ধরে ভারত সরকার তথা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেননি।

তার কারণ যে কি, তা বোঝা যায়নি—কেউ বুঝতে পারেনি এতদিন। কিন্তু ধীরে ধীরে সব ঘটনা একদিন পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ভারতের বার্তা বিশ্বে পৌঁছে দেবার জন্যে, বাংলাদেশের প্রকৃত তথ্য সারা বিশ্বে পৌঁছে দেবার জন্যে বের হলেন পৃথিবী ভ্রমণে।

বিশ্বের নানা দেশে গিয়ে তিনি প্রচার করলেন বাংলাদেশে কি ঘটেছে।

পনেরো লক্ষ লোক নিহত হয়েছে পাক সেনাদের নির্বিচার গুলিতে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রতিটি সহর মানুষের শবের স্তূপে ভরে উঠছে।

সাধারণ মানুষদের জীবন, সম্পত্তি এমন কি তাদের ঘরের মেয়েদের নিয়ে পাক সেনারা ছিনিমিনি খেলেছে। এক লক্ষ বাঙালী নারী হয়েছে নিখোঁজ বা ধর্ষিতা। ভারতের বুকে এসে জমেছে এক কোটি শরণার্থীর বোঝা।

শরণ সিং বিদেশে ঘুরলেও সবাই জানাল শুধুমাত্র মৌখিক সহানুভূতি। সবাই বললে যে, রাজনৈতিক সমাধান চাই। কিন্তু কি সে সমাধান, কেমন করে তা হবে তা কেউ বললেন না।

তারপর তিনি গেলেন আমেরিকায়। প্রেসিডেণ্ট নিকসন জানলেন

তিনি ভারতকে শরণার্থীদের জন্য সাহায্য দেবেন। তিনি প্রচুর সহানুভূতি জানালেন ভারতের এই শরণার্থীর বোঝা বহনের জন্যে।

শরণ সিং মহানন্দে ফিরে এলেন ভারতে। কিন্তু তিনি তার ঠিক পরেই খেলেন প্রচণ্ড ধাক্কা। আমেরিকা থেকে জাহাজ জাহাজ অস্ত্র পাঠানো হতে লাগল পাকিস্তানে। শরণ সিং তার প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হলো না।

কিন্তু এদিকে মুক্তিফৌজ বর্ষার শেষে দুর্বার গতিতে আক্রমণ চালালো পূর্ববাংলায়। এই আক্রমণের ফলে ইয়াহিয়া খাঁর সব প্ল্যান ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল।

বাংলাদেশের গেরিলা বাহিনী নিয়মিত রাতের আঁধারে হানা দিতে লাগল পূর্ববাংলায়। তাতে বিপর্যস্ত হয়ে ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করল ভারতের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। ঘন ঘন সে জেহাদী জিগীর চালাতে লাগল।

ইন্দিরাজী দেখলেন যে, এই অবস্থায় তাঁর একমাত্র উপায় হলো কোনও এক বৃহৎ শক্তির সঙ্গে আঁতাত করা। তা না হলে এই বৃহত্তর বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না।

তাই তিনি ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত বা সোভিয়েট দেশকে অন্য যে কোন দেশ আক্রমণ করলে দুজনে একসঙ্গে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

এই চুক্তি এত সত্বর সংঘটিত হলো যে ভারতের যারা বিরুদ্ধবাদী তারাও বিস্মিত হলো। বিস্ময়ে এবং আতংকে চমকে উঠল চীন ও আমেরিকা—সেই সঙ্গে ইয়াহিয়া খাঁ।

সবচেয়ে বেশি ফল হলো এই যে, সারা পৃথিবীটা যে দুটি ক্যাম্পে ভাগ হয়ে গেছিল, ভারত প্রথম তার একটি ক্যাম্পে যোগ দিল।

সাময়িকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খাঁর যুদ্ধের জিগীর বন্ধ হলো।

এদিকে এই দুর্যোগের দিনে ভারতনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা বের হলেন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ভ্রমণ করতে।

তিনি ঘুরলেন বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে।

সব দেশই জানালো মৌখিক সহানুভূতি। কিন্তু ভারতের উপরে যে এককোটি শরণার্থীর বোঝা, ভারতের যে অসহনীয় অবস্থা তাতে মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া ইয়াহিয়া খাঁর উপরে চাপ সৃষ্টি করতে রাজী হলেন না কেউ।

ইন্দিরাজী ফিরলেন ভারতে।

এদিকে তাঁর নির্দেশে চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে সহায়তা করল ভারত। ভারত আর তার মিত্র রাষ্ট্ররা ভোট দিল যাতে চীন রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশ করে ও তাইওয়ান স্বীকৃতি না পায়। তাই হলো। চীন প্রবেশ করল রাষ্ট্রপুঞ্জে—তাইওয়ান বহিষ্কৃত হলো সেখান থেকে।

কিন্তু চীন রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রবেশ করেই ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করে দিল। চীন বললে ভারত হচ্ছে আক্রমণকারী। ভারতের জন্যেই পূর্ববাংলার বুকে এই বিপুল শরণার্থী সৃষ্টি হয়েছে।

চীনের এইসব অবাস্তব কথা কেউ বিশ্বাস করল না। তবে চীন যে ভারতের ঘোর বিরোধী ও আমেরিকা এবং পাকিস্তানের বন্ধু তা প্রমাণিত হলো।

চীনের এই উক্তিতে আবার জোর পেলো পাকিস্তান। সে ভারতের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধের হুংকার ছাড়তে লাগল।

* * *

এদিকে মুক্তিফৌজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল পূর্ববাংলার নানা অংশে।

ধ্বংস হতে লাগল খান সেনারা।

ইয়াহিয়া খাঁ তার পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান বর্ডারে সৈন্য সমাবেশ করলেন। ভারতও তার জবাবে সৈন্য সমাবেশ করল পশ্চিম পাকিস্তান বর্ডারে।

আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি শক্তিরা ভারতকে সৈন্য অপসারণ করতে বললো। বললে—তোমরা সংযত হও, শান্ত হও, তোমরা যুদ্ধ করো না।

বিদেশী শক্তিরা ভারত ও পাকিস্তানকে একই আসনে বসালো। তার মানে ভারতের সঙ্গে যেন পাকিস্তানের সংঘাত হচ্ছে।

ভারত বললে—এটা পূবের সঙ্গে পশ্চিমের সংগ্রাম। এতে ভারতকে জড়ানো অর্থহীন। ইয়াহিয়ার পক্ষে উচিত হলো ভারতের সঙ্গে ঝগড়া না করে পূর্ববাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলা। তা হলে ভারতের বুকে যে এক কোটি শরণার্থী রয়েছে, তারা দেশে ফিরে যাবার সুযোগ পাবে।

ভারতের সঙ্গে আমেরিকা ও চীনের কূটনৈতিক লড়াই চললো রাষ্ট্রপুঞ্জে।

* * *

এদিকে আর একটি ঘটনা ঘটল সেটার জন্যে ভারত আগে থেকেই তৈরী ছিল।

৫ই ডিসেম্বর গভীর রাতে পাকিস্তানী বিমানবহর আচমকা ভারতের আটটি বিমানবন্দরের উপর বোমা বর্ষণ করল।

ইন্দিরাজী সেদিন এসেছিলেন কোলকাতায়। তিনি কোলকাতা সহরে বিরাট জনসমক্ষে এক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন যে, ভারত কখনো যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। কিন্তু যদি জোর করে কেউ ভারতের উপরে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তা হলে ভারত নিশ্চয়ই তার মোকাবিলা করবে। ভারত শান্তিকামী হলেও তাকে ভয় দেখিয়ে কেউ কোনও কাজ হাসিল করতে পারবে না।

তিনি তারপর ভারতের পশ্চিম সীমান্তে বিমান আক্রমণের খবর পেয়ে চলে গেলেন দিল্লীতে।

ইয়াহিয়া খাঁ ভেবেছিলো ইস্রায়েলের কায়দায় ভারতের আটটি বিমানবন্দরে হানা দিয়ে ভারতকে স্তব্ধ করে দেবে চিরদিনের মতো। তার বিমানবহর ভেঙ্গে পড়বে।

কিন্তু ভারত আগে থেকেই ছিল প্রস্তুত। বিমানগুলি ছিল গুপ্ত জায়গায়। তাছাড়া প্রস্তুত ছিল বিমানধ্বংসী কামানগুলি।

তাই পাকিস্তান কোনও সুবিধা করতে পারল না। শুধু কয়েকটি বিমানবন্দরের সামান্য ক্ষতি হলো মাত্র।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরাজীর আদেশে ভারতীয় বিমানবহর গিয়ে পশ্চিমের আটটি বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করল।

তার আগে পূর্ব সীমান্তে ঘটেছিল আর একটি ঘটনা।

পূর্ব প্রান্তে ইয়াহিয়ার সৈন্যরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতের উপরে গোলাবর্ষণ করছিল। বিমানবাহিনী ভারতসীমা লঙ্ঘন করছিল।

ইন্দিরাজীর আদেশে ভারতীয় সেনারা পূর্ববাংলায় প্রবেশ করে তাদের ১৪টি ট্যাংক ধ্বংস করে ফিরে এলো। চারটি স্যাবার জেট প্লেন ভারতসীমা লঙ্ঘন করলে তাদের তিনটিকে খতম করল ভারতীয় ন্যাট বিমান।

সব ঘটনা দেখলেন ইয়াহিয়া।

তিনি রাগে ক্ষেপে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে।

৬ই ডিসেম্বর তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বিপুলভাবে আক্রমণ করল পাকিস্তানী সেনারা।

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড সংগ্রাম।

পাক সেনারা ভারত আক্রমণ করল।

ভারত সরকার পূর্ব দিকে ভারতীয় সেনাকে মুক্তিফৌজের সঙ্গে

মিলে মিশে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। পশ্চিম দিকেও তাঁরা পাক ফৌজের আক্রমণ প্রতিহত করে পাকিস্তান আক্রমণ করলেন।

পূর্ব সীমান্তে ভারতীয় সেনারা দ্রুত বাংলাদেশের জমি দখল করে নিতে লাগল। পাক সেনারা হলো মৃত বা অবরুদ্ধ।

পশ্চিম পাকিস্তানেও ভারত জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিপুল সাফল্য অর্জন করতে লাগল।

সব রণাঙ্গণে ভারতীয়রা এগিয়ে যেতে লাগল। পাকিস্তানী জাহাজ, সাবমেরিণ ডুবে যেতে লাগল একে একে। বিপুলসংখ্যায় ট্যাংক ধ্বংস হতে লাগল। প্লেন ধ্বংস হতে লাগল ভারতের চতুর্গুণ।

সবদিক থেকে মার খেয়ে ইয়াহিয়া খাঁ নিরাপত্তা পরিষদে তার দোস্ত আমেরিকাকে লেলিয়ে দিল।

আমেরিকা ও চীন সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জে বিপুল আন্দোলন শুরু করে দিল।

তারা বললে - ভারত আক্রমণকারী, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

তার বিরুদ্ধে রাশিয়া পর পর তিনবার ভেটো প্রয়োগ করল। প্রমাণ করল যে রাশিয়া ভারতের প্রকৃত বন্ধু।

তারপর সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করল যে, যদি কোনও বিদেশী শক্তি ভারত-পাক যুদ্ধে নাক গলায়, তবে তা আগুন নিয়ে খেলা করা হবে। সোভিয়েট রাশিয়া তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

একথা শুনে বিশ্বের সব শক্তিরা চিন্তিত হলো—তাদের গতি স্তব্ধ হলো।

যে সব বিদেশী শক্তিরা ভেবেছিল যে এই যুদ্ধে অংশ নেবে, তারা এগিয়ে আসতে সাহস পেলো না।

তারা স্তব্ধ হতে বাধ্য হলো—কারণ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যাওয়া মানেই বিশ্বযুদ্ধ।

১৭

যেমনটি আশা করা গেছিল ঠিক তেমনটি হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। তা করেছে আমেরিকা এবং চীন। এটি সরাসরি ভারতের স্বার্থের একান্ত বিরুদ্ধে।

পাকিস্তানের দোস্ত সব বাবু আর মুরুব্বিদের এর জন্যে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি।

চক্রান্তটা নিরাপত্তা পরিষদের চড়ায় ঠেকে যাবার পর তারা সেটাকে টেনে নামিয়েছে সাধারণ পরিষদের মাঝ দরিয়ায়। কিন্তু তার মাঝিমাল্লারা জানে না এই দরিয়ার জলও অগভীর আর প্রচুর ঘোলা।

তবু রণাঙ্গনে পয়লা রাউণ্ডে কাবু হয়ে পিণ্ডি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দ্বিতীয় রাউণ্ডে খানিকটা সুবিধা করে নিতে পেরেছে বৈকি। মেড়ার মতো সে গুঁতাতে এসেছিল, কিন্তু জানত নিজের জোরে লড়তে সে পারবে না। তাই গোড়া থেকেই কেবল খুঁটি খুঁজেছে।

খুঁটির জোর না থাকলে সে জানে তার কোনও বাঁচার আশা নেই।

সেই জোর কিন্তু আন্তর্জাতিক ঐ আড্ডাখানায় ফতোয়াটা মিলিয়ে দেবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের ইদানীং যা স্বরূপ তাতে তাকে এক অড্ডখানা বললে ভুল হবে না। আড্ডাটা বসে নিউ ইয়র্কের একটা কাঁচের বাড়িতে।

কাঁচের বাড়িতে যাদের বাস তাদেরই অনেকে মিলে অন্য বাড়ির দিকে ঢিল ছুঁড়েছে। ঢিল মানে শুধু বড় বড় কথার থান ইট।

বত্রিশটা রাষ্ট্রের প্রস্তাব যেন বত্রিশটা দাঁত বের করে ভ্যাংচাচ্ছে। ভ্যাংচাচ্ছে নিজেকেই। নামে বত্রিশটা দেশ—আসলে তারা চীন

মার্কিণের ব-কলম ছাড়া কিছু নয়। অনেকেই আমেরিকা আর ওয়াশিংটনের বেনামদার। বেনামীতে করের মারফৎ পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষক। তুনিয়ার হাটে অধীর হয়ে সখের সওদা করে নিয়েছে।

কিন্তু ফতোয়াটার কোনও নখদন্ত আছে কিনা তা সন্দেহ। অস্ত্রসংবরণের আহ্বানে ভারত সাড়া দেয়নি—পাকিস্তানও দেবে না। সেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে—তাদের বিমান আমাদের বিমান বন্দরে আগে হামলা করেছে—আমরা করেছি তারপরে। পাকিস্তানই করেছে যুদ্ধ ঘোষণা—ভারত করেনি।

নিকসন সাহেব পাকিস্তানের আচরণে কোনও আক্রমণ কেন দেখেননি তা আশ্চর্য। এখনও তিনি প্রায় রোজ মুখ খোলেন—উদ্দেশ্য ভারতকে সংযত করা—পাকিস্তানকে নয়। আর বাংলাদেশের প্রশ্নে কোনও কথা তিনি আজও বলেননি। রাষ্ট্রপুঞ্জের বয়ানে পিণ্ডির ঘৃণ্যতম কীর্তির উপরেও তিনি দিয়েছেন শুধু আশীর্বাদের শীলমোহর।

বাংলাদেশের গণহত্যাকারী পিণ্ডিশাহীকে ঘৃণা করে একটি কথাও বলেননি নিকসন।

আর সবচেয়ে মজার কথা, সমস্ত ব্যাপারটিই একটা শিবহীন যজ্ঞের মতো। যে বাংলাদেশকে নিয়ে এত প্রশ্ন, তাদের কোনও প্রতিনিধির কথা শোনা প্রয়োজন মনে করেননি নিকসন বা তার সঙ্গী-সাথীরা। যে জুরীরা এজলাস বসিয়েছেন, তারা বাংলাদেশের একজন সাক্ষীকেও ডাকেননি। লীগ অফ নেশন্‌স্ যে পথে চলেছিল, আজ রাষ্ট্রপুঞ্জও চলেছে ঠিক সেই পথে। তার ফল যে কি হবে তা চিন্তা করাও যায় না।

* * * *

দীর্ঘ আট মাস ধরে প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপকে ঠেকিয়ে রাখার পর অবশেষে শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশের গণ-প্রজাতন্ত্রী সরকারকে স্বীকৃতি দিলেন! সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দিল ভূটান। এবং ১৬ই নভেম্বর

বৃহস্পতিবার ঢাকার পতন হলো। সমস্ত পাক সৈন্য ভারতীয় সৈন্যদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করল। ঐতিহাসিক যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হল।

অন্য কোনও দেশ অবিলম্বে ঐ সরকারকে স্বীকৃতি দিক বা না দিক জন্মের রজতজয়ন্তী বর্ষে পাকিস্তান যে আজ সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত তাতে আর সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রভুদের কূট কৌশলে পাকিস্তান নামধারী দৈত্যটির বস্তুটির জন্ম, আমেরিকার রাজনীতিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের কোলে বসে ভারবৃদ্ধি, সেই ভৌগলিক ও রাজনীতিক বস্তুটির পুরোণো পরিচয় এখন শুধু ইতিহাসের বিষয়।

বাংলাদেশ থেকে পাক সেনাদের পুরোপুরি হটিয়ে দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন মুক্তিবাহিনী –তাদের কিছু সময় লাগবে দেশ পুনর্গঠনে।

কিন্তু সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক সত্য বস্তুটিকে আর অস্বীকার করা চলবে না। বাংলাদেশের অস্তিত্ব এখন ভারতের অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা।

কোনও শক্তি বা শক্তিগোষ্ঠী যাতে এই প্রতিষ্ঠাকে বানচাল করে দিতে না পারে ভারত সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। লক্ষ্য রাখবে ভারত বন্ধু সোভিয়েট সরকার।

তাছাড়া স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি পাবার পর তার উজ্জ্বল অভ্যুদয়ের পর পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেকে স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা শুরু করবে একথা নিশ্চিত।

পাকিস্তানের দুই অংশ চিরকাল একদেশ হিসাবে থাকতে পারতো না। দুই অংশের মধ্যে পার্থক্যগুলি একেবারে মৌলিক পার্থক্য।

পশ্চিম পাকিস্তানীরা নিজেদের পূর্ব পাকিস্তান রূপ উপনিবেশের প্রভু বলে মনে করে অবস্থাটা আরও খারাপ করে তুলেছিল।

জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ যাতে যুক্তির পথ ধরেন এবং শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনীতিক বোঝাপড়ায় আসেন, তার জন্য তার উপরে চাপ সৃষ্টি করতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য কূটনীতিকরা গত চার মাস ধরে বিশ্বের নানা দেশের কাছে বহুবার আবেদন করেছেন।

চারটি দেশ—সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, আমেরিকা এবং ব্রিটেনের উপরেই এ ব্যাপারে ভারত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

আমেরিকার আচরণ বরাবরই ক্ষতিকর। সে সামরিক যন্ত্রে বরাবর তেল মাখিয়ে এসেছে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের বড় করে ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। আমেরিকার নির্দেশেই তাই বেলজিয়াম এবং ইতালী পাক ভারত যুদ্ধের উপরে বিরোধী প্রস্তাব পেশ করেছিল।

আমেরিকার হাবভাবে মনে হচ্ছে যে, ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক হুমকি দিতে চায়। প্রচুর ক্ষমতাশালী আমেরিকান নৌবহরের কয়েকটি জাহাজ মালাক্কা প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে আসছে বলেও খবর পাওয়া যায়। তবে তাদের পরবর্তী কার্যকলাপ কিছু দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেরা। তারা প্রকাশ্যে বিরুদ্ধ আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তারা থেকেছে নিরপেক্ষ।

সবচেয়ে আশ্চর্য হলো সমাজতন্ত্রী চীনের ভূমিকা। চীন প্রায়ই তার সমাজবাদী অহমিকা দেখায়। সে নাকি বিশ্বের সব নিপীড়িত জনগণের বন্ধু। যে কোনও বিপ্লবী শক্তির বন্ধু।

পাক-ভারত যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠার পর ভারত অবশ্য পিকিংয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চেয়েছে। কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয়নি। অবশ্য চীন ভুট্টোর কথামত পাক-চীন সামরিক চুক্তিতেও রাজী হয়নি।

কিন্তু তবু রাষ্ট্রপুঞ্জে চীন কি করে মার্কিণীদের পক্ষে সহায়তা করল, তা এক পরম বিস্ময়।

ঔপনিবেশিক নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই চীন চিরদিন নাকি সাহায্য করে। তা হলে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে সহায়তা না করে সে কি করে ইয়াহিয়া খাঁকে সমর্থন জানাল তা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

বাংলাদেশের ব্যাপারে পিকিং সরাসরি পিণ্ডির পক্ষ নিয়ে লড়ছে। তা হলে তারা এতদিন যে বলে আসছিল যে তারা ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে তা কি শুধু ধাপ্পা ?

এ ধাপ্পা চীন দিয়েছে এর আগে ভিয়েৎনাম ও ল্যাটিন আমেরিকায়। তাই আজ তাদের কথা ভেবে মানুষ বিস্মিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে অবশ্য মার্কিণ ভূমিকা একটা নির্দিষ্ট রূপ নিচ্ছে। তা হলো, তারা সব সময় তাদের চাপিয়ে দেওয়া পক্ষকেই সমর্থন করে আসছে। আজও ঘটেছে ঠিক তাই।

আমেরিকা এশিয়ার নানা দেশে স্বৈরশাসক কিংবা স্বৈরতন্ত্রী নেতাকে মাথায় বসিয়ে ক্রীড়নক সরকার গড়ার চেষ্টা করেছে।

এখানেও ঠিক তাই। ইয়াহিয়া নুরুল আমীন ও ভুট্টোকে নিয়ে একটা পুতুল সরকার বসাবার চেষ্টা করে চলেছিল। তাকেই সাপোর্ট করছে আমেরিকা।

অবশ্য এসব করেছে নিকসন।

মার্কিণ জনগণ এটা চাননি। চায়নি রবার্ট কেনেডি প্রভৃতি বিভিন্ন নেতারা।

তাই তারা এর বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে চীৎকার করেছে।

মার্কিণ সংবাদপত্রগুলো—প্রধানতঃ নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌ও তাই বলে আসছে।

তারা বলেছে নিকসনের দোষেই আজ ইয়াহিয়ার এত স্পর্ধা—হত্যাকাণ্ড করার সাহস!

তা শুনেও নিকসন যে কি করে নির্লজ্জভাবে সাপোর্ট করছে ইয়াহিয়াকে তা একটি বিস্ময়।

* * * *

দিনের পর দিন নানা রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে—নবগঠিত রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ও দেবে। এদিকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী সারা বাংলাদেশ দখল করে নিয়েছে। নিকসনের ঘুম নেই আজ। তিনি তাই শুধু ছট্‌ফট্‌ করছেন।

তবু স্বাধীন বাংলাদেশ নিশ্চিত সত্য—তা অস্বীকার করার উপায় নেই কারো। যদি কেউ তাকে অস্বীকার করে, তাহলে সে নিশ্চয় মুর্খের স্বর্গে বাস করছে। আজ আর তাকে ফেরাবার বা তাকে অস্বীকার করার কোনও পথ খোলা নেই।

২৫শে মার্চ থেকে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘটনাবলী

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গী বাহিনী দুর্বার গতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামীর ওপর নৃশংস অত্যাচার চাল'ল। স্বাধীনতাকামী বাংলার মানুষের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে, বিষয়-সম্পত্তি লুট করল। লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুত্যাগী করল আর করল নারীধর্ষণ। এই বর্বর অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী বিশ্বের প্রতিটি শান্তিকামী ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে বিচলিত করে তুলল।

প্রতিবেশী ভারত শুধু মর্মাহত নয়, গণতন্ত্রের এইভাবে গলা টিপে মারার ঘটনায় সর্বাত্মকভাবে উৎকণ্ঠিত হয়, সারা ভারত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ভারত এই গণহত্যার বেদনাদায়ক ঘটনাবলী বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন। মানবাত্মার মানে শরণার্থীর সেবায় এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিশ্ববিবেক এতেও আশানুরূপ জাগ্রত হয়নি। চীন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বৈরী মনোভাব বাংলাদেশের সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। জল্লাদ ইয়াহিয়া খাঁ ও তাঁর পাকিস্তানী বাহিনীকে নিরস্ত করতে বিশ্ব উদ্যোগী হোল না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দেওয়া, বাংলাদেশের গণ-প্রজাতন্ত্রী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে একটা স্থায়ী মীমাংসায় রাষ্ট্রসংঘ এগিয়ে এলো না। পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থনকারী ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তার স্বৈরাচারী সৈন্য নিয়ে ৩রা ডিসেম্বর। এখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ চলল।

ঘটনাপঞ্জী

২৫শে মার্চঃ—ঢাকা ও অন্যত্র পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা মুক্তিকামী বাঙালীর আওয়ামী লীগ কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, অসংখ্য মানুষের জীবননাশ ঘটায় এবং ঐ রাত্রেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করে।

২৬শে মার্চ ঢাকা, যশোহর, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা সহ সকল প্রধান প্রধান অঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা সাধারণ মানুষের ওপর নারকীয় অত্যাচার, ধরপাকড়, লুটপাট শুরু করে জেঃ টিক্কা খাঁর নির্দেশে। ঐ দিন আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়।

২৮শে মার্চ—প্রায় ৩ লক্ষাধিক মুক্তিকামী বাঙালীকে হত্যা করা হয়।

৩১শে মার্চ—ভারতীয় সংসদ বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সমবেদনা ও সৌভ্রাতৃত্ব জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

৩রা এপ্রিল—রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খাঁকে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য অনুরোধ জানান।

৯ই এপ্রিল—পিকিং থেকে চীনা নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে।

১১ই এপ্রিল—গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়।

২০শে এপ্রিল—বাংলাদেশ সরকারের অন্তবর্তীকালীন সংবিধান রচিত হয়।

২৪শে এপ্রিল—হরিদাসপুর সীমান্তে ভারতীয় রক্ষী বাহিনীর চৌকী ও শুল্ক বিভাগীয় অফিসের দিকে পাক সৈন্য গুলি চলায়।

২৯শে এপ্রিল—পাকিস্তান তার কলকাতা মিশন বন্ধ করে দেয় এবং ভারতকে ঢাকাস্থ মিশন বন্ধের জন্য দাবী জানায়।

৬ই মে—ভারত পাকিস্তানের কাছে হুশিয়ারী নোট পাঠায় এবং সীমান্তে উস্কানিমূলক কাজকর্ম বন্ধ করতে আহ্বান জানায়।

১৫ই মে—ভারতে আগত শরণার্থীরা যাতে বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারে তার জন্য পাকিস্তান সরকারকে আবার কড়া নোট প্রেরিত হয়।

১৯শে মে—পাকিস্তান সৈন্যরা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর নৌকার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে একজন নিহত হয়।

২৩শে মে—ইয়াহিয়া খাঁ ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি ঘোষণা করেন।

২৪শে মে—ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের কাছে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ঐ দিনেই পাক সেনারা সুতারকান্দিতে গুলি চালায় এবং পাঁচজন ভারতীয় নাগরিক এতে মারা যান।

৯ই জুন—ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং রুশ নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারত ও রাশিয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের ব্যাপারে একটা রাজনৈতিক মীমাংসার প্রয়োজনীয়তার ওপর দৃঢ়তা ঘোষণা করেন এবং শরণার্থীরা যাতে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন সেরূপ অবস্থা সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দেন।

১৬ই জুন—বৃটিশ পার্লামেন্টের ১২০ জন শ্রমিক দলীয় সদস্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী জানান।

২৪শে জুন—আমেরিকা থেকে অস্ত্র বোঝাই পাক জাহাজ যাতে

না আসে তার জন্য ভারত আমেরিকার কাছে অনুরোধ জানায়। আমেরিকা এতে রাজী হয় নি।

৭ই জুলাই—ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে জানান যে, পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। এই সরবরাহ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

১৯শে জুলাই—মুক্তিবাহিনী ঢাকার কাছে তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর আঘাত হানে।

২০শে জুলাই—মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে পাক সেনারা শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, রংপুর সেক্টরে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে।

২৭শে জুলাই—মুক্তিবাহিনী সারা বাংলাদেশে লড়াই করে প্রায় ২৫০০ পাক সেনা খতম করেছে বলে দাবী করে।

১লা আগস্ট—পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের হুমকি দেয়।

১১ই আগস্ট—রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের বিচার শুরু হয়।

২০শে আগস্ট—মুক্তিবাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরে ডিনামাইটে তিনটি জাহাজ খতম করে।

৩রা অক্টোবর—পাক বাহিনীর কাশ্মীর ও পাঞ্জাব সীমান্তে মোতায়েন শুরু হয়।

১৪ই অক্টোবর—মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের হাতে পূর্ববঙ্গের প্রাক্তন গভর্ণর মোনেম খাঁ নিহত।

২৫শে অক্টোবর—পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের উপ-নির্বাচনী প্রহসনে ৭৮ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

১২ই নভেম্বর—করিমগঞ্জ মহকুমায় পাকিস্তানী গোলায় ছ'জন ভারতীয় নাগরিক নিহত।

২৩শে নভেম্বর—পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

২৯শে নভেম্বর—ঢাকার চার পাশে গ্রামগুলো পাক সেনা কর্তৃক নিশ্চিহ্ন।

৩০শে নভেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শান্তির নিদর্শন স্বরূপ বাংলাদেশ থেকে সরাসরি পাক সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেন। ভারতের দৃঢ় মনোভাবে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট মিঃ নিকসনের গোসা।

হিলি সীমান্তে, শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহ জেলায় মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে পাক সেনার জোর লড়াই।

১লা ডিসেম্বর—বালুরঘাটে আবার পাক গোলা। পাক গোলাবর্ষণ স্তব্ধ করতে বাংলাদেশের ভেতর হিলির উত্তরে ভারতীয় বাহিনীর আত্মরক্ষা মূলক প্রয়াস। শামসেরনগর ও দর্শনা দখলের লড়াই চলে।

পূর্ব বাংলা সীমান্তে রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার জন্য পাকিস্তানের অনুরোধটি পরিষদ সদস্যদের বিলি করা হয়।

২রা ডিসেম্বর—আগরতলায় পাক বিমান বাহিনীর হানা, গোলাবর্ষণ, জম্মুতে পাক জেট বিমানের আবির্ভাব। বালুরঘাটে পাক ও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে লড়াই। পাক জেটের পলায়ন।

পাক এলাকায় ঢুকে পাকিস্তানের আক্রমণের জবাব দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের নির্দেশ।

৩রা ডিসেম্বর—পশ্চিম সীমান্তে পাক বিমান বাহিনীর অতর্কিত হানা।

৬ই ডিসেম্বর—বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি দান।

১৩ই ডিসেম্বর—ভারতীয় বাহিনীর ঢাকা কেন্দ্রে আঘাত।

১৫ই ডিসেম্বর—নিয়াজীর যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব। মানেকশার আত্মসমর্পণের উপদেশ।

১৬ই ডিসেম্বর—নিয়াজির ও সমস্ত ফৌজের বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ এবং ঢাকার পতন।

॥ সমাপ্ত ॥